হা-মীম আস সাজদাহ

৪১

নামকরণ

দুটি শব্দের সমন্বয়ে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। একটি শব্দ حٰمٓ ও অপরটি السجدة । অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা শুরু হয়েছে হা–মীম শব্দ দিয়ে এবং যার মধ্যে এক স্থানে সিজদার আয়াত আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময়কাল হচ্ছে হযরত হামযার (রা) ঈমান আনার পর এবং হযরত উমরের (রা) ঈমান আনার পূর্বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাচীনতম জীবনীকার মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল–কারযীর বরাত দিয়ে এই কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন কিছু সংখ্যক কুরাইশ নেতা মসজিদে হারামের মধ্যে আসর জমিয়ে বসেছিল এবং মসজিদের অন্য এক কোণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী বসেছিলেন। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা যখন হযরত হামযা ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশরা প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাংগঠনিক উন্নতি দেখে অস্থির হয়ে উঠছিলো। এই সময় 'উতবা ইবনে রাবী'আ (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) কুরাইশ নেতাদের বললেন, ভাইসব, আপনারা যদি ভালো মনে করেন তাহলে আমি গিয়ে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আলাপ করতে এবং তাঁর কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে পারি। সে হয়তো তার কোনটি মেনে নিতে পারে এবং আমাদের কাছেও তা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে। আর এভাবে সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। উপস্থিত সবাই তার সাথে একমত হলো এবং 'উতবা উঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বসলো। নবী (সা) তার দিকে ফিরে বসলে সে বললো ঃ ভাতিজা, বংশ ও গোত্রের বিচারে তোমার কওমের মধ্যে তোমার যে মর্যাদা তা তুমি অবগত আছো। কিন্তু তুমি তোমার কওমকে এক মুসিবতের মধ্যে নিক্ষেপ করেছো। তুমি কওমের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছো। গোটা কওমকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছো। কওমের ধর্ম ও তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেছো এবং এমন কথা বলতে শুরু করেছো যার সারবস্তু হলো, আমাদের সকলের বাপ দাদা কাফের ছিল। এখন আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শোন। আমি তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব রাখছি প্রস্তাবগুলো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো। "হয়তো তার কোনটি তুমি গ্রহণ করতে পার।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আপনি বলুন, আমি শুনবো। সে বললো ঃ ভাতিজা, তুমি যে কাজ শুরু করেছো তা দিয়ে সম্পদ অর্জন যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে এতো সম্পদ দেব যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে সম্পদশালী হয়ে

যাবে। এভাবে তুমি যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে থাকো তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিচ্ছি, তোমাকে ছাড়া কোন বিষয়ে ফায়সালা করবো না। যদি তুমি বাদশাহী চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নিচ্ছি। আর যদি তোমার ওপর কোন জিন প্রভাব বিস্তার করে থাকে যাকে তুমি নিজে তাড়াতে সক্ষম নও তাহলে আমরা ভালো ভালো চিকিৎসক ডেকে নিজের খরচে তোমার চিকিৎসা করিয়ে দেই। 'উতবা এসব কথা বলছিলো আর নবী (সা) চুপচাপ তার কথা শুনছিলেন। অতপর তিনি বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আপনি কি আপনার সব কথা বলেছেন? সে বললো ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তাহলে এখন আমার কথা শুনুন। এরপর তিনি "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে এই সূরা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। 'উতবা তার দুই হাত পেছনের দিকে মাটিতে হেলান দিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে থাকলো। সিজদার আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি সিজদা করলেন এবং মাথা তুলে বললেন ঃ হে আবুল ওয়ালীদ, আমার জবাবও আপনি পেয়ে গেলেন। এখন যা ইচ্ছা করেন।" 'উতবা উঠে কুরাইশ নেতাদের আসরের দিকে অগ্রসর হলে লোকজন দূর থেকে তাকে দেখেই বললো ঃ আল্লাহর শপথ! 'উতবার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল এটা সেই চেহারা নয়। সে এসে বসলে লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কি শুনে এলে? সে বললো ঃ "আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা এর আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম! এটা না কবিতা, না যাদু, না গণনা বিদ্যা। হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, আমার কথা শোন এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। আমার বিশ্বাস, এ বাণী সফল হবেই। মনে করো আরবের লোকেরা যদি তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে তাহলে নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা থেকে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং অন্যরাই তাকে পরাভূত করবে। পক্ষান্তরে সে যদি আরবদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব এবং তার সম্মান ও মর্যাদা তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা হবে।" তার এই কথা শোনা মাত্র কুরাইশ নেতারা বলে উঠলো ঃ "ওয়ালীদের বাপ, শেষ পর্যন্ত তোমার ওপর তার যাদুর প্রভাব পড়লো" 'উতবা বললো ঃ "আমি আমার মতামত তোমাদের সামনে পেশ করলাম। এখন তোমাদের যা ইচ্ছা করতে থাকো।" (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪)

আরো কতিপয় মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে শব্দগত কিছু মতপার্থক্য আছে। ঐ সব রেওয়ায়েতের কোন কোনটিতে এ কথাও আছে যে, নবী (সা) তিলাওয়াত করতে করতে যে সময়

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ –

(এখন যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এদেরকে বলে দাও আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির আযাবের মত অকস্মাত আগমনকারী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।) আয়াতটি পড়লেন তখন 'উতবা আপনা থেকেই তাঁর মুখের ওপর হাত চেপে ধরে বললো ঃ "আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের কওমের প্রতি সদয় হও।" পরে সে কুরাইশ নেতাদের কাছে তার এ কাজের কারণ বর্ণনা করেছে, এই বলে যে, আপনারা জানেন, মুহাম্মাদের (সা) মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা সত্যে পরিণত হয়। তাই আমি আমাদের ওপর আযাব নাযিল না হয় এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯০–৯১, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২)।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য

'উতবার এই কথার জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বক্তব্য নাযিল হয়েছে তাতে সে নবীকে (সা) যে অর্থহীন কথা বলেছে সেদিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয়নি। কারণ, সে যা বলেছিলো তা ছিল প্রকৃতপক্ষে নবীর (সা) নিয়ত ও জ্ঞান–বুদ্ধির ওপর হামলা। তার গোটা বক্তব্যের পেছনে এই অনুমান কাজ করছিল যে, তাঁর নবী হওয়া এবং কুরআনের অহী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই অনিবার্যরূপে তাঁর এই আন্দোলনের চালিকা শক্তি হয় ধন–সম্পদ এবং শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের প্রেরণা, নয়তো তাঁর জ্ঞান–বুদ্ধিই লোপ পেয়ে বসেছে (নাউযুবিল্লাহ)। প্রথম ক্ষেত্রে সে নবীর (সা) সাথে বিকিকিনির কারবার করতে চাচ্ছিলো। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে এ কথা বলে নবীকে (সা) হেয় করছিলো যে, আমরা নিজের খরচে আপনার উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করে দিচ্ছি। এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিরোধীরা যখন এ ধরনের মূর্খতার আচরণ করতে থাকে তখন তাদের এ কাজের জবাব দেয়া শরীফ সম্ভ্রান্ত মানুষের কাজ হয় না। তার কাজ হয় তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরা। কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে সে সময় চরম হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রের মাধ্যমে যে বিরোধিতা করা হচ্ছিলো 'উতবার বক্তব্য উপেক্ষা করে এখানে সেই বিরোধিতাকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আপনি যাই করেন না কেন আমরা আপনার কোন কথাই শুনবো না। আমরা আমাদের মনের গায়ে চাদর ঢেকে দিয়েছি এবং কান বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের ও আপনার মাঝে একটি প্রাচীর আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, যা আপনাকে ও আমাদের কখনো এক হতে দেবে না।

তারা তাঁকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলো, আপনি আপনার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান, আপনার বিরোধিতায় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর সবই আমরা করবো।

তারা নবীকে (সা) পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী তৈরী করেছিলো তা হচ্ছে, যখনই তিনি কিংবা তাঁর অনুসারীদের কেউ সর্বসাধারণকে কুরআন শুনানোর চেষ্টা করবেন তখনই হৈ চৈ ও হট্টগোল সৃষ্টি করতে হবে এবং এতো শোরগোল করতে হবে যাতে কানে যেন কোন কথা প্রবেশ না করে।

কুরআন মজীদের আয়াত সমূহের উল্টা পাল্টা অর্থ করে জনসাধারণের মধ্যে নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজ তারা পূর্ণ তৎপরতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছিলো। কোন কথা বলা হলে তারা তাকে ভিন্ন রূপ দিতো। সরল সোজা কথার বাঁকা অর্থ করতো। পূর্বাপর প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্থানের একটি শব্দ এবং আরেক স্থানের একটি বাক্যাংশ নিয়ে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরো অধিক কথা যুক্ত করে নতুন নতুন বিষয়বস্তু তৈরী করতো যাতে কুরআন ও তার উপস্থাপনকারী রাসূল সম্পর্কে মানুষের মতামত খারাপ করা যায়।

অদ্ভূত ধরনের আপত্তিসমূহ উত্থাপন করতো যার একটি উদাহরণ এ সূরায় পেশ করা হয়েছে। তারা বলতো, আরবী ভাষাভাষী একজন মানুষ যদি আরবী ভাষায় কোন কথা

শোনায় তাতে মু'জিযার কি থাকতে পারে? আরবী তো তার মাতৃভাষা। যে কেউ ইচ্ছা করলে তার মাতৃভাষায় একটি বাণী রচনা করে ঘোষণা করতে পারে যে, সেই বাণী তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। মু'জিযা বলা যেতো কেবল তখনই যখন হঠাৎ কোন ব্যক্তি তার অজানা কোন ভাষায় একটি বিশুদ্ধ ও উন্নত সাহিত্য রস সমৃদ্ধ বক্তৃতা শুরু করে দিতো। তখনই বুঝা যেতো, এটা তার নিজের কথা নয়, বরং তা ওপরে কোথাও থেকে তার ওপর নাযিল হচ্ছে।

অযৌক্তিক ও অবিবেচনা প্রসূত এই বিরোধিতার জবাবে যা বলা হয়েছে তার সারকথা হলো ঃ

(১) এ বাণী আল্লাহরই পক্ষ থেকে এবং আরবী ভাষায় নাযিলকৃত। এর মধ্যে যেসব সত্য স্পষ্টভাবে খোলামেলা বর্ণনা করা হয়েছে মূর্খেরা তাঁর মধ্যে জ্ঞানের কোন আলো দেখতে পায় না। কিন্তু জ্ঞান–বুদ্ধির অধিকারীরা সে আলো দেখতে পাচ্ছে এবং তা দ্বারা উপকৃতও হচ্ছে। এটা আল্লাহর রহমত যে, মানুষের হিদায়াতের জন্য তিনি এ বাণী নাযিল করেছেন। কেউ তাকে অকল্যাণ ভাবলে সেটা তার নিজের দুর্ভাগ্য। যারা এ বাণী কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছে তাদের জন্য সু–খবর। কিন্তু যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদের সাবধান হওয়া উচিত।

(২) তোমরা যদি নিজেদের মনের ওপর পর্দা টেনে এবং কান বধির করে দিয়ে থাকো, সে অবস্থায় নবীর কাজ এটা নয় যে, যে শুনতে আগ্রহী তাকে শুনাবেন আর যে শুনতে ও বুঝতে আগ্রহী নয় জোর করে তার মনে নিজের কথা প্রবেশ করাবেন। তিনি তোমাদের মতই একজন মানুষ। যারা শুনতে আগ্রহী তিনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারেন এবং যারা বুঝতে আগ্রহী কেবল তাদেরকেই বুঝাতে পারেন।

(৩) তোমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করে নাও আর মনের ওপর পর্দা টেনে দাও প্রকৃত সত্য এই যে, একজনই মাত্র তোমাদের আল্লাহ, তোমরা অন্য কোন আল্লাহর বান্দা নও। তোমাদের হঠকারিতার কারণে এ সত্য কখনো পরিবর্তিত হওয়ার নয়। তোমরা যদি এ কথা মেনে নাও এবং সে অনুসারে নিজেদের কাজকর্ম শুধরে নাও তাহলে নিজেদেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যদি না মানো তাহলে নিজেরাই ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

(৪) তোমরা কার সাথে শিরক ও কুফরী করছো সে বিষয়ে কি তোমাদের কোন অনুভূতি আছে? তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে শিরক ও কুফরী করছো যিনি বিশাল ও অসীম এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন, যিনি যমীন ও আসমানের স্রষ্টা, যার সৃষ্ট কল্যাণ সমূহ দ্বারা তোমরা এই পৃথিবীতে উপকৃত হচ্ছো এবং যার দেয়া রিযিকের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছো? তাঁরই নগণ্য সৃষ্টি সমূহকে তোমরা তাঁর শরীক বানাচ্ছো আর এ বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করলে জিদ ও হঠকারিতা করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো?

(৫) ঠিক আছে, যদি মানতে প্রস্তুত না হও সে ক্ষেত্রে আদ ও সামূদ জাতির ওপর যে ধরনের আযাব এসেছিল অকস্মাত সে ধরনের আযাব আপতিত হওয়া সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও। এ আযাবও তোমাদের অপরাধের চূড়ান্ত শাস্তি নয়। বরং এর পরে আছে হাশরের জবাবদিহি ও জাহান্নামের আগুন।

(৬) সেই মানুষ বড়ই দুর্ভাগা যার পেছনে এমন সব জিন ও মানুষ শয়তান লেগেছে যারা তাকে তার চারদিকেই শ্যামল–সবুজ মনোহর দৃশ্য দেখায়, তার নির্বুদ্ধিতাকে তার সামনে সুদৃশ্য বানিয়ে পেশ করে এবং তাকে কখনো সঠিক চিন্তা করতে দেয় না। অন্যের কথা শুনতেও দেয় না। এই শ্রেণীর নির্বোধ লোকেরা আজ এই পৃথিবীতে পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্ছে ও লোভ দেখাচ্ছে এবং প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রশ্রয় পেয়ে দিনকাল ভালই কাটাচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দুর্ভাগ্যের পালা আসবে তখন তাদের প্রত্যেকেই বলবে, যারা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিলো তাদের হাতে পেলে পায়ের তলায় পিষে ফেলতাম।

(৭) এই কুরআন একটি অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ। তোমরা নিজেদের হীন চক্রান্ত এবং মিথ্যার অস্ত্র দিয়ে তাকে পরাস্ত করতে পারবে না। বাতিল পেছন থেকে আসুক, মুখোশ পরে আসুক কিংবা পরোক্ষভাবে আক্রমণ করুক কখনো তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না।

(৮) তোমরা যাতে বুঝতে পার সে জন্য কুরআনকে আজ তোমাদের নিজেদের ভাষায় পেশ করা হচ্ছে। অথচ তোমরা বলছো, কোন অনারব ভাষায় তা নাযিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমাদের হিদায়াতের জন্য যদি আমি কুরআনকে আরবী ছাড়া ভিন্ন কোন ভাষায় নাযিল করতাম তাহলে তোমরাই বলতে, এ কোন ধরনের তামাশা, আরব জাতির হিদায়াতের জন্য অনারব ভাষায় বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে যা এখানকার কেউই বুঝে না। এর অর্থ, হিদায়াত লাভ আদৌ তোমাদের কাম্য নয়। কুরআনকে না মানার জন্য নিত্য নতুন বাহানা তৈরী করছো মাত্র।

(৯) তোমরা কি কখনো এ বিষয়টি ভেবে দেখেছো, যদি এটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় যে, এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাহলে তা অস্বীকার করে এবং তার বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হয়ে তোমরা কোন পরিণতির মুখোমুখি হবে?

(১০) আজ তোমরা এ কুরআনকে মানছো না। কিন্তু অচিরেই নিজের চোখে দেখতে পাবে, এ কুরআনের দাওয়াত দশ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তোমরা নিজেরা তার কাছে পরাজিত হয়ে গিয়েছো। তখন তোমরা বুঝতে পারবে, ইতিপূর্বে তোমাদের যা বলা হয়েছিল তা ছিল সত্য।

বিরোধীদেরকে এসব জবাব দেয়ার সাথে সাথে এই চরম প্রতিকূল পরিবেশে ঈমানদারগণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যে সমস্যাবলীর সম্মুখীন ছিলেন সেদিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। মুমিনদের পক্ষে সে সময় তাবলীগ ও প্রচার তো দূরের কথা ঈমানের পথে টিকে থাকাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছিলো। যে ব্যক্তি সম্পর্কেই প্রকাশ হয়ে পড়তো যে, সে মুসলমান হয়ে গিয়েছে সে–ই শাস্তির যাঁতাকলে পিষ্ট হতো। শত্রুদের ভয়াবহ জোটবদ্ধতা এবং সর্বত্র বিস্তৃত শক্তির মোকাবিলায় তারা নিজেদেরকে একেবারেই অসহায় ও বন্ধুহীন মনে করছিলো। এই পরিস্থিতিতে প্রথমত এই বলে তাদেরকে সাহস যোগানো হয়েছে যে, তোমরা সত্যি সত্যিই বান্ধব ও সহায়হীন নও। বরং যে ব্যক্তিই একবার আল্লাহকে তার রব মেনে নিয়ে সেই আকীদা ও পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে তার কাছে আল্লাহর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং দুনিয়া থেকে শুরু করে

আখেরাত পর্যন্ত তার সাথে থাকে। অতপর তাকে সাহস ও উৎসাহ যোগানো হয়েছে এ কথা বলে যে, সেই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট যে নিজে সৎ কাজ করে, অন্যদের আল্লাহর দিকে আহবান জানায় এবং সাহসিকতার সাথে বলে, আমি মুসলমান।

সেই সময় যে প্রশ্নটি নবীর (সা) সামনে অত্যন্ত বিব্রতকর ছিল তা হচ্ছে, এসব জগদ্দল পাথর যখন এ আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন এসব পাথরের মধ্যে দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের রাস্তা কিভাবে বের করা যাবে? এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য নবীকে (সা) বলা হয়েছে, এসব প্রদর্শনীমূলক বাধার পাহাড় বাহ্যত অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু উত্তম নৈতিক চরিত্রের হাতিয়ার এমন হাতিয়ার যা ঐ সব বাধার পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ করে গলিয়ে দেবে। ধৈর্যের সাথে উত্তম নৈতিক চরিত্রকে কাজে লাগাও এবং যখনই শয়তান উত্তেজনা সৃষ্টি করে অন্য কোন হাতিয়ার ব্যবহার করতে উস্কানি দেবে তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

حٰمٓ ① تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ② كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا
عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ③ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ
لَا يَسْمَعُوْنَ ④ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ
اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑤

হা–মীম। এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জিনিস। এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কুরআন। সেই সব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী।[১]

কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনতেই পায় না। তারা বলে ঃ তুমি আমাদের যে জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছো সে জিনিসের ব্যাপারে আমাদের মনের ওপর পর্দা পড়ে আছে,[২] আমাদের কান বধির হয়ে আছে এবং তোমার ও আমাদের মাঝে একটি পর্দা আড়াল করে আছে।[৩] তুমি তোমার কাজ করতে থাকো আমরাও আমাদের কাজ করে যাবো।[৪]

১. এটা এই সূরার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। পরবর্তী বক্তব্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে এ ভূমিকায় আলোচিত বিষয়বস্তুর পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে যে সাদৃশ্য আছে তা বুঝা যেতে পারে।

প্রথমে বলা হয়েছে, এ বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ যতদিন ইচ্ছা তোমরা এ অপপ্রচার চালাতে থাকো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ সব কথা রচনা করছেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, এ বাণী বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে এসেছে। তাছাড়া এ কথা বলে শ্রোতাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এ বাণী শুনে যদি তোমরা অসন্তুষ্ট হও তাহলে তোমাদের সেই অসন্তুষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নয়, আল্লাহর বিরুদ্ধে। যদি তা প্রত্যাখ্যান করো তাহলে

কোন মানুষের কথা প্রত্যাখ্যান করছো না, আল্লাহর নিজের কথা প্রত্যাখ্যান করছো। আর যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকো তাহলে কোন মানুষ থেকে মুখ ফিরাচ্ছো না বরং, খোদ আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।

দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তাহচ্ছে এই যে, এ বাণী নাযিলকারী মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান (রাহমান ও রাহীম)। এ বাণী নাযিলকারী আল্লাহর আর সব গুণাবলীর পরিবর্তে 'রহমত' গুণটি এ সত্যের প্রতি ইংগিত করে যে, তিনি তাঁর দয়ার দাবী অনুসারে এ বাণী নাযিল করেছেন। এর দ্বারা শ্রোতাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, কেউ যদি এ বাণীর প্রতি রুষ্ট হয় বা একে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা ভ্রুকুঞ্চিত করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে নিজের সাথেই শত্রুতা করে। এটা বিরাট এক নিয়ামত যা আল্লাহ মানুষকে পথ প্রদর্শন এবং তার সাফল্য ও সৌভাগ্যের জন্য সরাসরি নাযিল করেছেন। আল্লাহ যদি মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন তাহলে তাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরার জন্য পরিত্যাগ করতেন এবং তারা কোন গর্তে গিয়ে পতিত হবে তার কোন পরোয়াই করতেন না। কিন্তু সৃষ্টি করা ও খাদ্য সরবরাহ করার সাথে সাথে তার জীবনকে সুন্দর করে গোছানোর জন্য জ্ঞানের আলো দান করাও তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন এবং সে কারণেই তাঁর এক বান্দার কাছে এ বাণী নাযিল করছেন, এটা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই রহমত দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হয় তার চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ এবং নিজেই নিজের দুশমন আর কে হতে পারে?

তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এই কিতাবের আয়াত সমূহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এর কোন কথাই অস্পষ্ট ও জটিল নয়, যার ফলে এ কিতাবের বিষয়বস্তু কারো বোধগম্য হয় না বলে সে তা গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করতে পারে না। হক ও বাতিল কি, সত্য সঠিক আকীদা–বিশ্বাস ও ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস কি, ভাল ও মন্দ নৈতিক চরিত্র কি, সৎ কাজ ও নেক কাজ কি, কোন পথের অনুসরণে মানুষের কল্যাণ এবং কোন পথ অবলম্বনে তার নিজের ক্ষতি এ গ্রন্থে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি এরূপ সুস্পষ্ট ও খোলামেলা হিদায়াত প্রত্যাখ্যান করে কিংবা সেদিকে মনযোগ না দেয় তাহলে সে কোন ওজর ও অক্ষমতা পেশ করতে পারে না। তার এই আচরণের সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে সে ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

চতুর্থ কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এটা আরবী ভাষার কুরআন। অর্থাৎ এ কুরআন যদি অন্য কোন ভাষায় নাযিল হতো তাহলে আরবরা অন্তত এ ওজর পেশ করতে পারতো যে, আল্লাহ যে ভাষায় তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন আমরা সে ভাষার সাথেই পরিচিত নই। কিন্তু এ গ্রন্থ তাদের নিজের ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তা না বুঝার অজুহাত পেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। (এখানে সূরার ৪৪ আয়াতটিও সামনে থাকা দরকার। এ আয়াতে এই বিষয়টিই অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনারবদের জন্য কুরআনের দাওয়াত গ্রহণ না করার যে যুক্তিসংগত ওজর বিদ্যমান আমরা ইতিপূর্বে তার জবাব দিয়েছি। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, টীকা ৫; রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২৩)

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ⑥ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ⑦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑧

হে নবী, এদের বলে দাও, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ।[৫] আমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় যে, একজনই মাত্র তোমাদের ইলাহ[৬] কাজেই সোজা তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হও[৭] এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।[৮] মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত দেয় না।[৯] এবং আখেরাত অস্বীকার করে। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, নিশ্চিতভাবে তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।[১০]

পঞ্চম কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এ কিতাব তাদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী। অর্থাৎ কেবল জ্ঞানী লোকেরাই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। অজ্ঞ লোকদের কাছে তা ঠিক তেমনি মূল্যহীন যেমন একটি মূল্যবান হীরক খণ্ড এমন ব্যক্তির কাছে মূল্যহীন যে সাধারণ পাথর ও হীরক খণ্ডের পার্থক্য জানে না।

ষষ্ঠ কথাটি বলা হয়েছে এই যে, এ কিতাব সু–সংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ এটা শুধু এমন নয় যে, এটা শুধু এক কল্পনাচারিতা, একটি দর্শন এবং একটি আদর্শ রচনা শৈলী পেশ করে, যা মানা না মানায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। এ গ্রন্থ বরং চিৎকার করে ডেকে ডেকে গোটা দুনিয়াকে সাবধান করে দিচ্ছে যে, একে মেনে চলার ফলাফল অত্যন্ত শুভ ও মহিমময় এবং না মানার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও ধ্বংসকর। এ ধরনের গ্রন্থকে কেবল কোন নির্বোধই অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করতে পারে।

২. অর্থাৎ আমাদের মন পর্যন্ত তার পৌছার কোন পথই খোলা নেই।

৩. অর্থাৎ এই আন্দোলন আমাদের ও তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তা আমাদের ও তোমাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এটা এমন এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আমাদের ও তোমাদেরকে এক হতে দেয় না।

৪. এর দুটি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমার সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে তোমার কোন সংঘাত নেই। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তুমি যদি তোমার আন্দোলন থেকে বিরত না হও তাহলে নিজের কাজ করে যেতে থাকো। আমরাও তোমার বিরোধিতা পরিত্যাগ করবো না এবং তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আমরা সাধ্যমত সব কিছুই করবো।

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ
مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا
وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

হে নবী, এদের বলো, তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরী করছো এবং অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তিনিই বিশ্ব জাহানের সবার রব। তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) ওপর থেকে তার ওপর পাহাড় স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দান করেছেন।[১১] আর তার মধ্যে সব প্রার্থীর জন্য প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পরিমাপে খাদ্য সরবরাহ করেছেন।[১২] এসব কাজ চার দিনে হয়েছে।[১৩] তার পর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন যা সেই সময় কেবল ধূঁয়া ছিল।[১৪] তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন ঃ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো ঃ আমরা অনুগতদের মতই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম।[১৫]

৫. অর্থাৎ তোমাদের মনের ওপরের পর্দা উন্মোচন করা, বধির কানকে শ্রবণ শক্তি দান করার এবং যে পর্দা দিয়ে তোমরা নিজেরা আমার ও তোমাদের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেছো তা সরিয়ে দেয়ার সাধ্য আমার নেই। আমিতো মানুষ। যে বুঝার জন্য প্রস্তুত আমি কেবল তাকেই বুঝাতে পারি, যে শোনার জন্য প্রস্তুত কেবল তাকেই শোনাতে পারি এবং যে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত কেবল তার সাথেই মিলতে পারি।

৬. অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মনের দুয়ারে পর্দা টাঙ্গিয়ে দাও আর কান বধির করে নাও, প্রকৃত সত্য হলো তোমাদের আল্লাহ অনেক নয়, বরং শুধু মাত্র একজনই। আর তোমরা সেই আল্লাহরই বান্দা। এটা আমার চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান–ধারণা প্রসূত কোন দর্শন নয় যে, তার সঠিক ও ভ্রান্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। আমার কাছে অহী পাঠিয়ে এ সত্য তুলে ধরা হয়েছে, যার ভুল–ত্রুটির লেশমাত্র থাকার সম্ভাবনা নেই।

৭. অর্থাৎ অন্য কাউকে আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করবে না, অন্য কারো দাসত্ব ও পূজা–অর্চনা করবে না, অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকবে না। আর কারো সামনে

আনুগত্যের মাথা নত করো না এবং অন্য কারো রীতি ও নিয়ম-কানুনকে অবশ্য অনুসরণীয় বিধান হিসেবে মেনে নিও না।

৮. আজ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের আল্লাহর সাথে যে বিশ্বাস হীনতার কাজ করে এসেছো এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে শিরক, কুফরী, নাফরমানি ও গোনাহ করে এসেছো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।

৯. এখানে 'যাকাত' শব্দের অর্থ কি তা নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস ও তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ছাত্র ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেন ঃ এখানে 'যাকাত' অর্থ আত্মার সেই পবিত্রতা যা তাওহীদের আকীদা এবং আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা অর্জিত হয়। এই তাফসীর অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হবে, 'যেসব মুশরিক পবিত্রতা অবলম্বন করে না তাদের জন্য ধ্বংস। তাফসীরকারদের আরেকটি গোষ্ঠী যার মধ্যে কাতাদা, সুদ্দী, হাসান বাসারী, দাহহাক, মুকাতিল ও ইবনুস সাইয়েবের মত তাফসীরকারও আছেন তাঁরা এখানে 'যাকাত' শব্দটিকে অর্থ-সম্পদের যাকাত অর্থ গ্রহণ করেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে, 'যারা শিরক করে আল্লাহর হক এবং যাকাত না দিয়ে বান্দার হক মারে তাদের জন্য ধ্বংস।'

১০. মূল আয়াতে أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথাটির আরো দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা কখনো হ্রাস পাবে না। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তা হবে এমন পুরস্কার যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে না বা সে জন্য খোঁটা দেয়া হবে না, যেমন কোন কৃপণ হিম্মত করে কোন কিছু দিলেও সে দানের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

১১. পৃথিবীর বরকতসমূহ অর্থ অঢেল ও সীমা সংখ্যাহীন উপকরণ যা কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমাগত পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং শুধু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায় এমন ক্ষুদ্র কীট থেকে শুরু করে মানুষের উন্নত সভ্যতার দৈনন্দিন চাহিদা সমূহ পূরণ করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বরকত হচ্ছে বাতাস ও পানি। কারণ, পানির বদৌলতেই ভূ-পৃষ্ঠে উদ্ভিদ, জীবকূল ও মানুষের জীবন সম্ভব হয়েছে।

১২. মূল আয়াতের বাক্য হচ্ছে قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ - سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ কতিপয় স্বতন্ত্র মতামত পেশ করেছেন।

কিছুসংখ্যক মুফাসসির এর অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ "পৃথিবীতে প্রার্থীদের সঠিক হিসাব অনুসারে তাদের সমুদয় রিযিক পুরা চার দিনে রাখা হয়েছে।" অর্থাৎ পুরো চার দিনে রাখা হয়েছে এর কম বা বেশী নয়।

ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা ও সুদ্দী এর অর্থ করেন ঃ "পৃথিবীতে তার রিযিকসমূহ চার দিনে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞেসকারীদের জবাব সম্পূর্ণ হয়েছে।" অর্থাৎ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, এ কাজ কতদিনে সম্পন্ন হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ জবাব হচ্ছে চার দিনে সম্পন্ন হয়েছে। ইবনে যায়েদ এর অর্থ বর্ণনা করেন ঃ "প্রার্থীদের জন্য পৃথিবীতে চার দিনের মধ্যে তাদের রিযিকসমূহ সঠিক পরিমাণে প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে রেখেছেন।"

ভাষার ব্যাকরণগত নিয়ম অনুসারে আয়াতের বাক্যাংশে এ তিনটি অর্থই গ্রহণ করার অবকাশ আছে। তবে আমাদের মতে প্রথমোক্ত অর্থ দুটিতে গুণগত কোন বিষয় নেই। স্থানকাল অনুসারে বিচার করলে এ কথা এমনকি গুরুত্ব বহন করে যে, কাজটি চার দিনের এক ঘন্টা কমে বা বেশীতে নয় বরং পূর্ণ চার দিনে সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহর কুদরত, রবুবিয়াত ও হিকমতে কি অপূর্ণতা ছিল যা পূরণ করার জন্য এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে? আয়াতের পূর্বের ও পরের বিষয়ের মধ্যে কোথাও এমন কোন ইংগিত নেই যা দ্বারা বুঝা যায় তখন কোন জিজ্ঞেসকারী এ প্রশ্ন করেছিলো যে এসব কাজ কতদিনে সম্পন্ন হয়েছিলো যার জবাব দিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো। এসব কারণে আমরা অনুবাদের মধ্যে তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছি। আমাদের মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকারের যত মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করবেন তাদের প্রত্যেকের সঠিক চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যের সব সরঞ্জাম হিসাব করে তিনি পৃথিবীর বুকে রেখে দিয়েছেন। স্থল ভাগে ও পানিতে অসংখ্য প্রকারের উদ্ভিদ রয়েছে। এদের প্রতিটি শ্রেণীর খাদ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন অন্য সব শ্রেণী থেকে ভিন্ন। আল্লাহ বায়ুমণ্ডল, স্থল ও পানিতে অসংখ্য প্রজাতির জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি প্রজাতিরই স্বতন্ত্র ধরনের খাদ্য প্রয়োজন। তাছাড়া এসব প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সৃষ্টি মানুষ। মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন শুধু দেহের লালন ও পরিপুষ্টি সাধনের জন্যই নয়, তার রুচির পরিতৃপ্তির জন্যও নানা রকম খাদ্যের প্রয়োজন। আল্লাহ ছাড়া আর কার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল মাটির তৈরী এই গ্রহটির ওপরে জীবনের উৎপত্তি থেকে শুরু করে তার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত কোন্ কোন্ শ্রেণীর সৃষ্টিকুল কত সংখ্যায় কোথায় কোথায় এবং কোন্ কোন্ সময় অস্তিত্ব লাভ করবে এবং তাদের প্রতিপালনের জন্য কোন প্রকারের খাদ্য কত পরিমাণে দরকার হবে। নিজের সৃষ্টি পরিকল্পনা অনুসারে যেভাবে তিনি খাদ্যের মুখাপেক্ষী এসব মাখলুককে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিলেন অনুরূপভাবে তাদের চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য সরবরাহেরও পূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন।

বর্তমান যুগে যেসব লোক মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইসলামী সংস্করণ কুরআনী নেজামে রবুবিয়াতের নামে বের করেছেন তারা سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ এর অনুবাদ করেন "সমস্ত প্রার্থীর জন্য সমান" আর এর ওপর যুক্তি প্রমাণের প্রাসাদ নির্মাণ করেন এই বলে যে, আল্লাহ পৃথিবীতে সব মানুষের জন্য সমপরিমাণে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য পূরণার্থে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন যা সবাইকে খাদ্যের সমান রেশন সরবরাহ করবে। কারণ, এই কুরআন যে সাম্য দাবী করে ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থায় তা কায়েম হতে পারে না। কিন্তু কুরআনের দ্বারা নিজেদের মতবাদসমূহের খেদমত করানোর অতি আগ্রহে তারা এ কথা ভুলে যান যে سَائِلِيْنَ বা প্রার্থী বলে এ আয়াতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে শুধু মানুষ নয় বিভিন্ন শ্রেণীর অন্যান্য সৃষ্টিও রয়েছে, জীবন ধারণের জন্য যাদের খাদ্যের প্রয়োজন। আল্লাহ কি প্রকৃতই এসব সৃষ্টির মধ্যে কিংবা তাদের এক একটি শ্রেণীর সবার মধ্যে জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে সাম্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রকৃতির গোটা ব্যবস্থাপনায় কোথাও কি আপনি সমানভাবে খাদ্য বন্টনের ব্যবস্থা দেখতে পান? প্রকৃত ব্যাপার যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ

হচ্ছে, উদ্ভিদ এবং জীবজগতের মধ্যে, যেখানে মানুষের পরিচালিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নেই, বরং আল্লাহর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সরাসরি রিযিক বন্টনের ব্যবস্থা করছে সেখানে আল্লাহ নিজেই এই "কুরআনী বিধান" লংঘন করেছেন—এমনকি (নাউযুবিল্লাহ) বে-ইনসাফী করেছেন? তারা এ কথাও ভুলে যায়, মানুষ যেসব জীবজন্তু পালন করে এবং যাদের খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব মানুষেরই তারাও سَائِلِيْنَ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ঃ ভেড়া, বকরী, গরু, মোষ, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ও উট প্রভৃতি। সব প্রার্থীকে সমান খাদ্য দিতে হবে এটাই যদি কুরআনী বিধান হয় এবং এ বিধান চালু করার জন্য "নেজামে রবুবিয়াত" পরিচালনাকারী একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে তাহলে সেই রাষ্ট্র কি মানুষ এবং এসব জীবজন্তুর মধ্যেও আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করবে?

১৩. এ স্থানের ব্যাখ্যায় সাধারণভাবে মুফাসসিরদেরকে একটি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জটিলতাটি হচ্ছে, যদি পৃথিবী সৃষ্টির দুই দিন এবং সেখানে পাহাড় স্থাপন, বরকত দান এবং খাদ্যোপকরণ সৃষ্টির জন্য চার দিন ধরা হয় সে ক্ষেত্রে পরে আসমান সৃষ্টির জন্য যে দুই দিনের কথা বলা হয়েছে সেই দুই দিনসহ মোট আট দিন হয়। কিন্তু আল্লাহ কুরআন মজীদের বেশ কিছু জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পৃথিবী ও আসমান সর্বমোট ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন— সূরা আল আরাফ ৫৪, সূরা ইউনুস ৩, সূরা হুদ ৭ এবং সূরা আল ফুরকান ৫৯ আয়াত সমূহ।)

এ কারণে প্রায় সমস্ত মুফাসসিরই বলেন ঃ এই চার দিন পৃথিবী সৃষ্টির দু' দিন সহ। অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির দু' দিন এবং উপরে যেসব জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীতে সেসব জিনিস সৃষ্টির জন্য আরো দু' দিন। এভাবে মোট চার দিনে পৃথিবী তার সব রকম উপায় উপকরণসহ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু একদিকে এটা কুরআন মজীদের বাহ্যিক বক্তব্যের পরিপন্থী আর মূলত যে জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে তা একান্তই কাল্পনিক। যে দু দিনে সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করা হয়েছে মূলত পৃথিবী সৃষ্টির দু দিন তা থেকে ভিন্ন নয়। পরবর্তী আয়াত সমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন দেখতে পাবেন সেখানে এক সাথে পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, আল্লাহ দু' দিনে সাত আসমান নির্মাণ করেছেন। এই সাত আসমান বলে বুঝানো হয়েছে গোটা বিশ্ব জাহান, আমাদের এই পৃথিবীও যার একটা অংশ। তারপর যখন বিশ্ব জাহানের অন্যান্য অসংখ্য তারকা ও গ্রহের মত এই পৃথিবীও উক্ত দু দিনে একটি গ্রহের আকৃতি ধারণ করলো। তখন আল্লাহ সেটিকে জীবকুলের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করলেন এবং চার দিনের মধ্যে সেখানে সেই সব উপকরণ সৃষ্টি করলেন পূর্বোক্ত আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। এ চার দিনে অন্যান্য তারকা ও গ্রহের কি উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে আল্লাহ এখানে তা উল্লেখ করেননি। কারণ যে যুগে কুরআন নাযিল হয়েছিলো সেই যুগের মানুষ তো দূরের কথা এ যুগের মানুষও সেসব তথ্য হজম করার সামর্থ রাখে না।

১৪. এখানে তিনটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। এক, এখানে আসমান অর্থ সমগ্র বিশ্ব জাহান। পরবর্তী আয়াতাংশ থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। অন্য কথায় আসমানের দিকে মনোনিবেশ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বিশ্ব জাহান সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করলেন।

দুই, বিশ্ব জাহানকে আকৃতি দানের পূর্বে তা আকৃতিহীন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গো ধূলির মত মহাশূন্যে বস্তুর প্রাথমিক অবস্থায় ছড়ানো ছিল। ধোঁয়া বলতে বস্তুর এই প্রাথমিক অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ এ জিনিসকেই নীহারিকা (Nebula) বলে ব্যাখ্যা করেন। বিশ্ব জাহান সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় সম্পর্কে তাদের ধ্যান–ধারণাও হচ্ছে, যে বস্তু থেকে বিশ্ব জাহান সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে তা এই ধোঁয়া অথবা নীহারিকার আকারে ছড়ানো ছিল।

তিন, "তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন" বাক্য দ্বারা এ কথা বুঝা ঠিক নয় যে, প্রথমে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তারপর তার ওপরে পাহাড় স্থাপন, বরকত দান এবং খাদ্য উপকরণ সরবরাহের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এসব করার পর তিনি বিশ্ব জাহান সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। পরবর্তী বাক্যাংশ "তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন ঃ তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো, আমরা অনুগতদের মতই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম" এই ভুল ধারণা নিরসন করে দেয়া এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন আসমান ও যমীন কিছুই ছিল না, বরং বিশ্ব জাহান সৃষ্টির সূচনা করা হচ্ছিলো শুধু ثُمَّ (তারপর, অতপর বা পরে) শব্দটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না যে আসমান সৃষ্টির পূর্বেই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিলো। ثُمَّ শব্দটি যে অনিবার্যরূপে সময়–ক্রম বুঝাতে ব্যবহৃত হয় না বর্ণনা–ক্রম বুঝাতেও ব্যবহৃত হয় কুরআন মজীদে তার বেশ কিছু উদাহরণ বিদ্যমান। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুমার, টীকা নম্বর ১২)

কুরআন মজীদের ভাষ্য অনুসারে প্রথমে যমীন না আসমান সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন যুগের মুফাসসিরদের মধ্যে এ নিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিতর্ক চলেছে। একদল এ আয়াত এবং সূরা বাকারার ২৯ আয়াতের মাধ্যমে যুক্তি পেশ করেন যে পৃথিবীই প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। অপর দল সূরা নাযিয়াতের ২৭ থেকে ৩৩ পর্যন্ত আয়াত হতে দলীল পেশ করে বলেন, আসমান প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আসমানের পরে যমীন সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পদার্থ বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যা শেখানোর জন্য কুরআন মজীদের কোথাও বিশ্ব জাহান সৃষ্টির বিষয় উল্লেখ করা হয়নি, বরং তাওহীদ ও আখেরাতের আকীদার প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে আরো অসংখ্য নিদর্শনের মত যমীন ও আসমানের সৃষ্টির বিষয়টিও চিন্তা–ভাবনা করে দেখার জন্য পেশ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আসমান ও যমীন সৃষ্টির সময়–ক্রম বর্ণনা করে যমীন আগে সৃষ্টি হয়েছে না আসমান আগে সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ একেবারেই অপ্রয়েজনীয় ছিল। দুটি বস্তুর মধ্যে এটি বা সেটি যেটিই প্রথমে সৃষ্টি হয়ে থাকুক সর্বাবস্থায় দুটিই আল্লাহর একমাত্র ইলাহ হওয়ার প্রমাণ। তা এ কথাও প্রমাণ করে যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা এ সমগ্র কারখানা কোন খেলোয়াড়ের খেলনা হিসেবে সৃষ্টি করেননি। এ কারণেই কুরআন কোন জায়গায় পৃথিবী সৃষ্টির কথা প্রথমে উল্লেখ করে আবার কোন জায়গায় প্রথমে উল্লেখ করে আসমান সৃষ্টির কথা যে ক্ষেত্রে মানুষের মনে আল্লাহর নিয়ামত সমূহের অনুভূতি সৃষ্টি উদ্দেশ্য হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণত যমীন সৃষ্টির উল্লেখ প্রথমে করেন। কারণ, তা মানুষের সবচেয়ে কাছে। আর যে ক্ষেত্রে আল্লাহর মহত্ব এবং তাঁর কুদরতের পূর্ণতার ধারণা দেয়া উদ্দেশ্য হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণত আসমানের উল্লেখ প্রথমে করেন। কারণ, সুদূরবর্তী আসমান চিরদিনই মানুষের মনের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আছে।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۲﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿۱۳﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

তারপর তিনি দু'দিনের মধ্যে সাত আসমান বানালেন এবং প্রত্যেক আসমানে তিনি তাঁর বিধান অহী করলেন। আর পৃথিবীর আসমানকে আমি উজ্জ্বল প্রদীপ দিয়ে সজ্জিত করলাম এবং ভালভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম।[১৬] এসবই এক মহা পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা।

এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়[১৭] তাহলে এদের বলে দাও আদ ও সামূদের ওপর যে ধরনের আযাব নাযিল হয়েছিলো আমি তোমাদেরকে অকস্মাত সেই রূপ আযাব আসার ব্যাপারে সাবধান করছি। সামনে ও পেছনে সব দিক থেকে যখন তাদের কাছে আল্লাহর রসূল এলো[১৮] এবং তাদেরকে বুঝালো আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না তখন তারা বললো ঃ আমাদের রব ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। সুতরাং তোমাদেরকে যে জন্য পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানি না।[১৯]

১৫. আল্লাহ এ আয়াতাংশে তাঁর সৃষ্টি পদ্ধতির অবস্থা এমন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন যার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি ও মানবীয় সৃষ্টি ক্ষমতার পার্থক্য পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যখন কোন জিনিস বানাতে চায় তখন প্রথমেই নিজের মন–মগজে তার একটা নকশা ফুটিয়ে তোলে এবং সে জন্য পরে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। তারপর ঐ সব উপকরণকে নিজের পরিকল্পিত নকশা ও কাঠামো অনুসারে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য পরিশ্রম করে ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালায়। যেসব উপকরণকে সে নিজের মগজে অংকিত নকশায় রূপদানের চেষ্টা করে চেষ্টার সময় তা একের পর এক বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। কখনো উপকরণের বাধা সফল হয় এবং কাংখিত বস্তু পরিকল্পিত নকশা অনুসারে ঠিকমত তৈরী হয় না। আবার কখনো ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রবল হয় এবং সে উপকরণ সমূহকে কাংখিত রূপদানে সফল হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ কোন দর্জি একটি জামা তৈরী করতে

চায়। এ জন্য সে প্রথমে তার মন–মগজে জামার নকশা ও আকৃতি কল্পনা করে। তারপর কাপড় সংগ্রহ করে নিজের পরিকল্পিত জামার নকশা অনুসারে কাপড় কাটতে ও সেলাই করতে চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টার সময় তাকে উপর্যুপরি কাপড়ের প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হয়। কারণ কাপড় তার পরিকল্পিত নকশা অনুসারে তৈরী হতে সহজে প্রস্তুত হয় না। এমনকি এ ক্ষেত্রে কখনো কাপড়ের প্রতিবন্ধকতা সফল হয় এবং জামা ঠিকমত তৈরী হয় না। আবার কখনো দর্জির প্রচেষ্টা সফল হয় এবং সে কাপড়কে তার পরিকল্পিত নকশায় রূপদান করে। এবার আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করুন। বিশ্ব জাহান সৃষ্টির উপরকণ ধূঁয়ার আকারে ছড়িয়ে ছিলো। বিশ্ব জাহানের বর্তমান যে রূপ আল্লাহ তাকে সেই রূপ দিতে চাইলেন। এ উদ্দেশ্যে তাকে বসে বসে কোন মানুষ কারিগরের মত পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য এবং অন্যান্য তারকা ও গ্রহ–উপগ্রহ বানাতে হয়নি। বরং তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্ব জাহানের যে নকশা ছিল সে অনুসারে তাকে অস্তিত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ তিনি যে ছায়াপথ, তারকারাজি এবং গ্রহ–উপগ্রহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন ঐ সব উপকরণ যেন সেই আকৃতি ধারণ করে সেই নির্দেশ দান করলেন। আল্লাহর আদেশের পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা ঐ সব উপকরণের ছিল না। ঐ উপকরণ সমূহকে বিশ্ব জাহানের আকৃতি দান করতে আল্লাহকে কোন পরিশ্রম করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়নি। একদিকে আদেশ হয়েছে আরেকদিকে ঐ সব উপকরণ সংকুচিত ও একত্রিত হয়ে অনুগতদের মত প্রভুর পরিকল্পিত নকশা অনুযায়ী তৈরী হতে শুরু করেছে এবং ৪৮ ঘন্টায় পৃথিবীসহ সমস্ত বিশ্ব জাহান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির এই অবস্থাকে কুরআন মজীদের আরো কতিপয় স্থানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু এই নির্দেশ দেন, 'হয়ে যাও' আর তখনি তা হয়ে যায়। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১১৫; আল ইমরান, টীকা ৪৪ ও ৫৩; আন নাহল, টীকা ৩৫ ও ৩৬; মারয়াম, টীকা ২২; ইয়াসীন, আয়াত ৮২ এবং আল মু'মিন, আয়াত ৬৮)।

১৬. এসব আয়াত বুঝার জন্য তাফহীমুল কুরআনের নিম্ন বর্ণিত স্থান সমূহ অধ্যয়ন করা সহায়ক হবে ঃ আল বাকারা, টীকা ৩৪; আর রা'আদ, টীকা ২; আল–হিজর, টীকা ৮ থেকে ১২; আল আম্বিয়া, টীকা ৩৪ ও ৩৫; আল–মু'মিনুন, টীকা ১৫; ইয়াসীন, টীকা ৩৭ এবং আস সাফফাত, টীকা ৫ ও ৬।

১৭. অর্থাৎ যিনি এই পৃথিবী ও সারা বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করেছেন তিনি একাই আল্লাহ ও উপাস্য এ কথা মানে না এবং বাস্তবে যারা তাঁর সৃষ্টি ও দাস তাদেরকে উপাস্য বানাবার এবং আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারে তাদেরকে শরীক করার জন্য জিদ করে যেতে থাকে।

১৮. এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, তাদের কাছে একের পর এক রসূল এসেছেন। দুই, রসূলগণ সব উপায়ে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন এং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য কোন উপায় ও পন্থা গ্রহণ করতেই কসুর করেননি। তিন, তাদের নিজ দেশেও তাদের কাছে রসূল এসেছেন এবং তাদের আশেপাশের দেশসমূহেও রসূল এসেছেন।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

তাদের অবস্থা ছিল এই যে, পৃথিবীতে তারা অন্যায়ভাবে নিজেদেরকে বড় মনে করে বসেছিলো এবং বলতে শুরু করেছিল ঃ আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা একথা বুঝলোনা যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকারই করে চললো। অবশেষে আমি কতিপয় অমঙ্গলকর দিনে তাদের ওপর প্রবল ঝড়ো বাতাশ পাঠালাম[২০] যেন পার্থিব জীবনেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনাকর আযাবের মজা চাখাতে পারি।[২১] আখেরাতের আযাব তো এর চেয়েও অধিক অপমানকর। সেখানে কেউ তাদের সাহায্যকারী থাকবে না।

আর আমি সামূদের সামনে সত্য পথ পেশ করেছিলাম কিন্তু তারা পথ দেখার চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকা পসন্দ করলো। অবশেষে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর লাঞ্ছনাকর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়লো। যারা ঈমান এনেছিলো এবং গোমরাহী ও দুষ্কৃতি থেকে দূরে অবস্থান করতো[২২] আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ যদি আমাদের এই ধর্ম পসন্দ না করতেন এবং এ ধর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠাতে চাইতেন তাহলে ফেরেশতা পাঠাতেন। তোমরা যেহেতু ফেরেশতা নও, বরং আমাদের মত মানুষ। তাই তোমাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আমরা এ কথা মানতে প্রস্তুত নই আর তোমরা যে দীন পেশ করছো আমরা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তা গ্রহণ করি এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তোমাদের পাঠিয়েছেন আমরা একথা মানতেও প্রস্তুত নই। "যে উদ্দেশ্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে" তা আমরা মানি না-কাফেরদের এ উক্তি ছিল তীব্র কটাক্ষ। এর অর্থ এ নয় যে,

তারা সেটাকে আল্লাহর প্রেরিত বলে জানতো কিন্তু তা সত্ত্বেও তা মানতে অস্বীকৃতি জানাতো। বরং ফেরাউন হযরত মূসা সম্পর্কে তার সভাসদদেরকে যে ধরনের বিদ্রুপাত্মক উক্তি করেছিলো এটাও সে ধরনের বিদ্রুপাত্মক বর্ণনাভঙ্গি। ফেরাউন তার সভাসদদের বলেছিলো ঃ

اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ (الشعرا ايت – ٢٧)

"যে রসূল সাহেবকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তাকে তো বদ্ধ পাগল বলে মনে হয়।" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, টীকা ১১)

২০. অমঙ্গলকর দিনের অর্থ এ নয় যে, দিনগুলোর মধ্যেই অমঙ্গল নিহিত ছিল। আর আদ জাতির ওপর এই অমঙ্গলকর দিন এসেছিলো বলেই যে আযাব এসেছিল তাও ঠিক নয়। এর অর্থ যদি তাই হতো এবং ঐ দিনগুলোই অমঙ্গলকর হতো তাহলে দূরের ও কাছের সব কওমের ওপরই আযাব আসতো। তাই এর সঠিক অর্থ হচ্ছে যেহেতু সেই দিনগুলোতে ঐ কওমের ওপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিলো তাই আদ কওমের জন্য সেই দিনগুলো ছিল অমঙ্গলকর। এ আয়াতের সাহায্যে দিনসমূহের মঙ্গলজনক ও অমঙ্গলজনক হওয়ার প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বুঝাতে "رِيْحًا صَرْصَرًا" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষাবিদদের মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এর অর্থ মারাত্মক 'লু' প্রবাহ; কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস এবং কারো কারো মতে এর অর্থ এমন বাতাস যা প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি হয়। তবে এ অর্থে সবাই একমত যে, শব্দটি প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ আযাব সম্পর্কে যেসব বিস্তারিত বর্ণনা আছে তা হচ্ছে, এ বাতাস উপর্যুপরি সাত দিন এবং আট রাত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিলো। এর প্রচণ্ডতায় মানুষ পড়ে গিয়ে এমনভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং মরে মরে পড়ে থাকে যেমন খেজুরের ফাঁপা কাণ্ড পড়ে থাকে (আল হাক্কাহ, আয়াত ৭)। এ বাতাস যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেলেছে (আয যারিয়াত, আয়াত ৪২)। যে সময় এ বাতাস এগিয়ে আসছিলো তখন আদ জাতির লোকেরা এই ভেবে আনন্দে মেতে উঠেছিলো যে, মেঘ চারদিক থেকে ঘিরে আসছে। এখন বৃষ্টি হবে এবং তাদের আশা পূর্ণ হবে। কিন্তু তা এমনভাবে আসলো যে গোটা এলাকাই ধ্বংস করে রেখে গেল (আল আহকাফ, আয়াত ২৪ ও ২৫)।

২১. যে অহংকার ও গর্বের কারণে তারা পৃথিবীতে বড় সেজে বসেছিলো এবং বুক ঠুকে বলতো ঃ আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে অপমান ও লাঞ্ছনাকর এ আযাব ছিল সেই অহংকার ও গর্বের জবাব। আল্লাহ এমনভাবে তাদেরকে লাঞ্ছিত করলেন যে, তাদের জনপদের একটি বড় অংশকে ধ্বংস করে দিলেন, তাদের সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন এবং যে ক্ষুদ্র অংশটি অবশিষ্ট রইলো তারা পৃথিবীর সেই সব জাতির হাতেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলো যাদের কাছে একদিন তারা শক্তির বড়াই করতো। (আদ জাতির বিস্তারিত কাহিনীর জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ,

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

৩ রুকূ'

আর সেই সময়ের কথাও একটু চিন্তা করো যখন আল্লাহর এসব দুশমনকে দোযখের দিকে যাওয়ার জন্য পরিবেষ্টিত করা হবে।[২৩] তাদের অগ্রবর্তীদেরকে পশ্চাদবর্তীদের আগমন করা পর্যন্ত থামিয়ে রাখা হবে।[২৪] পরে যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।[২৫] তারা তাদের শরীরের চামড়াসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা জবাব দেবে, সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন।[২৬] তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

টীকা ৫১ থেকে ৫৩; হুদ, টীকা ৫৪ থেকে ৬৬; আল মু'মিনূন, টীকা ৩৪ থেকে ৩৭; আশ–শু'আরা, টীকা ৮৮ থেকে ৯৪; আল আনকাবূত, টীকা ৬৫)।

২২. সামূদ জাতির বিস্তারিত কাহিনী জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫৭ থেকে ৫৯; হূদ, টীকা ৬৯ থেকে ৭৪; আল হিজর, টীকা ৪২ থেকে ৪৬; বনী ইসরাইল, টীকা ৬৮; আশ শুআরা, টীকা ৯৫ থেকে ১০৬; আন নামল, টীকা ৫৮ থেকে ৬৬।

২৩. মূল উদ্দেশ্য একথা বলা যে আল্লাহর আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তাদের পরিবেষ্টন করে আনা হবে। কিন্তু এ বিষয়টিকেই এ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, দোযখের দিকে যাওয়ার জন্য পরিবেষ্টন করে আনা হবে। কেননা দোযখে যাওয়াই তাদের শেষ পরিণাম।

২৪. অর্থাৎ এক একটি বংশ ও প্রজন্মের হিসাব–নিকাশ করে একটার পর একটা সিদ্ধান্ত দেয়া হবে তা নয়। বরং আগের ও পরের সমস্ত বংশ ও প্রজন্মকে একই সময়ে একত্র করা হবে এবং এক সাথেই তাদের হিসাব–নিকাশ নেয়া হবে। কারণ, কোন

মানুষ তার জীবনে ভাল মন্দ যে কাজই করুক না কেন তার জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার প্রভাব শেষ হয় না, বরং তার মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রভাবের জন্য সে-ই দায়ী। অনুরূপ একটি প্রজন্ম তার সময়ে যা কিছুই করে পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের মধ্যে তার প্রভাব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকে। এই উত্তরাধিকারের জন্য মূলত সে:ই দায়ী হয়। ভুল-ত্রুটি নির্ণয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এই সমস্ত প্রভাব ও ফলাফল পর্যালোচনা করা এবং তার সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে ধরা অপরিহার্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন প্রজন্মসমূহ একের পর এক আসতে থাকবে এবং তাদেরকে অবস্থান করানো হতে থাকবে। যখন আগের ও পরের সবাই এসে একত্রিত হবে তখনি কেবল আদালতের কার্যক্রম শুরু হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৩০)।

২৫. বিভিন্ন হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা এসেছে তা হচ্ছে যখন কোন একগুঁয়ে অপরাধী তার অপরাধ সমূহ অস্বীকার করতে থাকবে এবং সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণকেও মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতে তৎপর হবে তখন আল্লাহর আদেশে তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ এক এক করে সাক্ষ্য দিবে, সে ঐগুলোর সাহায্যে কি কি কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। হযরত আনাস (রা), হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, টীকা ৫৫)।

যেসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, আখিরাত শুধু একটি আত্মিক জগত হবে না, বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এই পৃথিবীতে জীবিত আছে—এ আয়াতটি তারই একটি। শুধু তাই নয়, যে দেহ নিয়ে তারা এই পৃথিবীতে আছে ঠিক সেই দেহই তাদের দেয়া হবে। যেসব উপাদান, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং অণু-পরমাণুর (Atoms) সমন্বয়ে এই পৃথিবীতে তাদের দেহ গঠিত কিয়ামতের দিন সেগুলোই একত্রিত করে দেয়া হবে এবং যে দেহে অবস্থান করে সে পৃথিবীতে কাজ করেছিলো পূর্বের সেই দেহ দিয়েই তাকে উঠানো হবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত দেহ নিয়ে সে পূর্বের জীবনে কোন অপরাধ করেছিলো সেই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই যদি সে অবস্থান করে কেবল তখনি সে সেখানে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে। কুরআন মজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলোও এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। বনী ইসরাঈল, আয়াত ৪৯ থেকে ৫১ ও ৯৮; আল মু'মিনূন, আয়াত ৩৫ থেকে ৩৮ এবং ৮২ ও ৮৩; আস সিজদা, আয়াত ১০; ইয়াসীন, আয়াত ৬৫, ৭৮ ও ৭৯; আস সাফফাত, আয়াত ১৬ থেকে ১৮; আল ওয়াকিয়া, ৪৭ থেকে ৫০ এবং আন নাযিআত, আয়াত ১০ থেকে ১৪।

২৬. এ থেকে জানা গেল কিয়ামতের দিন মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শুধু সাক্ষ্য দেবে না, যেসব জিনিসের সামনে মানুষ কোন কাজ করেছিলো তার প্রতিটি জিনিসই কথা বলে উঠবে। সূরা যিলযালে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ۝ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

পৃথিবীতে অপরাধ করার সময় যখন তোমরা গোপন করতে তখন তোমরা চিন্তাও করোনি যে, তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া কোন সময় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা তো বরং মনে করেছিলে, তোমাদের বহু সংখ্যক কাজকর্মের খবর আল্লাহও রাখেন না। তোমাদের এই ধারণা—যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে—তোমাদের সর্বনাশ করেছে এবং এর বদৌলতেই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।[২৭] *এ অবস্থায় তারা ধৈর্য ধারণ করুক (বা না করুক) আগুনই হবে তাদের ঠিকানা। তারা যদি প্রত্যাবর্তনের সুযোগ চায় তাহলে কোন সুযোগ দেয়া হবে না।*[২৮] *আমি তাদের ওপর এমন সব সঙ্গী চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা তাদেরকে সামনের ও পেছনের প্রতিটি জিনিস সুদৃশ্য করে দেখাতো।*[২৯] *অবশেষে তাদের ওপরও আযাবের সেই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হলো যা তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানব দলসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিলো। নিশ্চিতভাবেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।*

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝

"মাটির গভীরে যেসব ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে আছে তা সে বের করে দেবে। মানুষ বলবে এ কি ব্যাপার! সে দিন যমীন তার সব কথা শুনাবে (অর্থাৎ মানুষ তার উপরি ভাগে যা যা করেছে তার সব কাহিনী বলে দেবে।)। কারণ, তোমার রব তাকে বর্ণনা করার আদেশ প্রদান করবেন।"

২৭. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বাসারী (র) খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকে তার রব সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তার আচার-আচরণ সেই ধারণা অনুসারেই নির্ধারিত হয়। সৎ কর্মশীল ঈমানদারের আচরণ সঠিক হওয়ার কারণ সে তার রব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করে। আর কাফের, মুনাফিক ফাসেক ও জালেমের আচরণ ভ্রান্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, রব সম্পর্কে তার ধারণাই ভ্রান্ত হয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক হাদীসে এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ তোমাদের রব বলেন, انا عند ظن عبدى بى 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে আমি তার জন্য সেই ধারণার অনুরূপ।'

২৮. এ কথার অর্থ হতে পারে, দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইলে আসতে পারবে না। এ অর্থও হতে পারে যে, দোযখ থেকে বের হতে চাইলে বের হতে পারবে না। আবার এও হতে পারে যে, তওবা করতে বা অক্ষমতা প্রকাশ করতে চাইলে তা গ্রহণ করা হবে না।

২৯. এটা আল্লাহর স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বিধান। খারাপ নিয়ত ও খারাপ আকাংখা পোষণকারী মানুষকে তিনি কখনো ভাল সংগী যোগান না। তার ঝোঁক ও আগ্রহ অনুসারে তিনি তাকে খারাপ সঙ্গীই জুটিয়ে দেন। সে যতই দুষ্কর্মের নিকৃষ্টতার গহবরে নামতে থাকে ততই জঘন্য থেকে জঘন্যতর মানুষ ও শয়তান তার সহচর, পরামর্শদাতা ও কর্মসহযোগী হতে থাকে। কারো কারো উক্তি, অমুক ব্যক্তি নিজে খুব ভালো কিন্তু তার সহযোগী ও বন্ধু-বান্ধব জুটেছে খারাপ, এটা বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রকৃতির বিধান হলো, প্রতিটি ব্যক্তি নিজে যেমন তার বন্ধু জোটে ঠিক তেমনি। একজন সৎ ও নেক মানুষের সাহচর্যে খারাপ মানুষ আসলেও বেশী সময় সে তার সাথে থাকতে পারে না। অনুরূপ অসৎ উদ্দেশ্যে কর্মরত একজন দুষ্কর্মশীল মানুষের সাথে হঠাৎ সৎ ও সম্ভ্রান্ত মানুষের বন্ধুত্ব হলেও তা বেশী সময় টিকে থাকতে পারে না। অসৎ মানুষ প্রকৃতিগত-ভাবে অসৎ মানুষদেরই তার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তার প্রতি অসৎরাই আকৃষ্ট হয়। যেমন নোংরা ময়লা আবর্জনা মাছিকে আকৃষ্ট করে এবং মাছি নোংরা ময়লা আবর্জনার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আর বলা হয়েছে, তারা সামনের ও পেছনের প্রতিটি জিনিস সুদৃশ্য করে দেখাতো। এর অর্থ তারা তাদের মধ্যে এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতো যে, আপনার অতীত মর্যাদা ও গৌরবে ভরা এবং ভবিষ্যতও অত্যন্ত উজ্জ্বল। তারা তাদের চোখে এমন চশমা পরিয়ে দিতো যে, তারা চারদিকে কেবল সবুজ শ্যামল সোভাই দেখতে পেতো। তারা তাদের বলতো, আপনার সমালোচকরা নির্বোধ। আপনি কি কোন ভিন্ন ও বিরল প্রকৃতির কাজ করছেন? আপনি যা করছেন পৃথিবীতে প্রগতিবাদীরা তো তাই করে থাকে আর ভবিষ্যতে প্রথমত আখেরাত বলে কিছুই নেই, যেখানে আপনাকে নিজের সব কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তবে কতিপয় নির্বোধ আখেরাত সংঘটিত হওয়ার যে দাবী করে থাকে তা যদি সংঘটিত হয়ও তাহলে যে আল্লাহ এখানে আপনাকে নিয়ামত রাজি দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন সেখানেও তিনি আপনার ওপর পুরস্কার ও সম্মানের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। দোযখ আপনার জন্য তৈরী করা হয়নি, তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ এখানেও তাঁর নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ
فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا
تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

৪ রুকূ'

এসব কাফেররা বলে, এ কুরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন হট্টগোল বাধিয়ে দেবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে।[৩০] *আমি এসব কাফেরদের কঠিন শাস্তির মজা চাখাবো এবং যে জঘন্যতম তৎপরতা তারা চালিয়ে যাচ্ছে তার পুরো বদলা তাদের দেবো। প্রতিদানে আল্লাহর দুশমনরা যা লাভ করবে তা হচ্ছে দোযখ। সেখানেই হবে তাদের চির দিনের বাসস্থান। তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। এটা তাদের সেই অপরাদের শাস্তি। সেখানে এসব কাফের বলবে, 'হে আমাদের রব, সেই সব জিন ও মানুষ আমাদের দেখিয়ে দাও যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো। আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।*[৩১]

৩০. মক্কার কাফেররা যেসব পরিকল্পনার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলন ও তার প্রচারকে ব্যর্থ করে দিতে চাচ্ছিলো এটি ছিল তারই একটি। কুরআন কি অসাধারণ প্রভাব ক্ষমতার অধিকারী, কুরআনের দাওয়াত পেশকারী ব্যক্তি কেমন অতুলনীয় মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ এবং তাঁর এহেন ব্যক্তিত্বের সাথে উপস্থাপনার ভঙ্গি কেমন বিস্ময়করভাবে কার্যকর তা তারা ভালো করেই জানতো। তারা মনে করতো, এ রকম উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মুখ থেকে এমন হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে এই নজিরবিহীন বাণী যেই শুনবে সে শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হবেই। অতএব তারা পরিকল্পনা করলো, এ বাণী না নিজে শুনবে, না কাউকে শুনতে দেবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই তা শুনাতে আরম্ভ করবেন তখনই হৈ চৈ করবে। তালি বাজাবে, বিদ্রূপ করবে, আপত্তি ও সমালোচনার ঝড় তুলবে এবং চিৎকার জুড়ে দেবে যেন তার মধ্যে তাঁর কথা হারিয়ে যায়। তারা আশা করতো, এই কৌশল অবলম্বন করে তারা আল্লাহর নবীকে ব্যর্থ করে দেবে।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾

যারা [৩২]ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অতপর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে[৩৩] নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশতারা আসে[৩৪] এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না[৩৫] এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশী হও তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাংখা করবে তাই লাভ করবে। এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন যিনি ক্ষমাশীল ও দায়াবান।

৩১. অর্থাৎ পৃথিবীতে তো এরা তাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রতারক শয়তানদের ইংগিতে নাচছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বুঝতে পারবে এসব নেতা তাদের কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে তখন এরাই আবার তাদেরকে অভিশাপ দিতে থাকবে এবং চাইবে কোনভাবে তাদেরকে হাতের কাছে পেলে পায়ের নীচে ফেলে পিষ্ট করতে।

৩২. এ পর্যন্ত কাফেরদেরকে তাদের হঠকারিতা এবং ন্যায় ও সত্যের বিরোধিতার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করার পর এখন ঈমানদারদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হচ্ছে।

৩৩. অর্থাৎ হঠাত কখনো আল্লাহকে রব বলে ঘোষণা করেই থেকে যায়নি এবং এ ভ্রান্তিতেও লিপ্ত হয়নি যে, আল্লাহকে রব বলে ঘোষণাও করেছে এবং তার সাথে অন্যদেরকেও রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। বরং একবার এ আকীদা পোষণ করার পর সারা জীবন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, তার পরিপন্থী অন্য কোন আকীদা গ্রহণ করেনি কিংবা এর সাথে কোন বাতিল আকীদার সংমিশ্রণও ঘটায়নি এবং নিজের কর্মজীবনে তাওহীদের আকীদার দাবীসমূহও পূরণ করেছে।

তাওহীদের ওপর দৃঢ় থাকার অর্থ কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বড় বড় সাহাবা তার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام

"বহু মানুষ আল্লাহকে তাদের রব বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আবার কাফের হয়ে গিয়েছে। দৃঢ় পদ সেই ব্যক্তি যে মৃত্যু পর্যন্ত এই আকীদা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।" (ইবনে জারির, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

لم يشركوا بالله شيئا لم يلتفتوا الى اله غيره

"এরপর আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেনি, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্যের প্রতি আকৃষ্টও হয়নি।" (ইবনে জারির)

একবার হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু মিম্বরে উঠে এ আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ "আল্লাহর শপথ, নিজ আকীদায় দৃঢ় ও স্থির তারাই যারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শিয়ালের মত এদিক থেকে সেদিকে এবং সেদিক থেকে এদিকে ছুটে বেড়ায়নি।" (ইবনে জারির)।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ"নিজের আমলকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।" (কাশ্‌শাফ)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ "আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ করা ফরয সমূহ আনুগত্যের সাথে আদায় করেছে।" (কাশশাফ)

৩৪. উপলব্ধি করা যায় এমন অবস্থায় ফেরেশতারা নাযিল হবে এবং ঈমানদারগণ চর্মচোখে তাদের দেখবে কিংবা তাদের আওয়াজ কানে শুনতে পাবে এটা জরুরী নয়। যদিও মহান আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা ফেরেশতাকে প্রকাশ্যে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সাধারণত ঈমানদারদের কাছে বিশেষত যখন তারা ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের হাতে নাজেহাল হতে থাকে সেই সময় তাদের অবতরণ অমনুভূত পন্থায় হয় এবং তাদের কথা কানের পর্দায় প্রতিধ্বনিত হওয়ার পরিবর্তে হৃদয়ের গভীরে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি হয়ে প্রবেশ করে। কোন কোন তাফসীরকার ফেরেশতাদের এই আগমনকে মৃত্যুর সময় কিংবা কবরে অথবা হাশরের ময়দানের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করেছেন। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে যদি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা যায় তাহলে এই পার্থিব জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সমুন্নত করার জন্য যারা জীবনপাত করছে তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতরণের কথা বর্ণনা করাই যে এখানে মূল উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। যাতে তারা প্রশান্তি লাভ করতে পারে, মনোবল ফিরে পায় এবং এই অনুভূতিতে তাদের হৃদয়-মন পরিতৃপ্ত হয় যে, তারা সহযোগী ও বন্ধুহীন নয়, বরং আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের সাথে আছে। যদিও মৃত্যুর সময়ও ফেরেশতারা ঈমানদারদের স্বাগত জানাতে আসে, কবরে (আলমে বরযখ)ও তারা তাদের স্বাগত জানায় এবং যেদিন কিয়ামত হবে সেদিনও হাশরের শুরু থেকে জান্নাতে পৌঁছা পর্যন্ত সব সময় তারা তাদের সাথে থাকবে। তবে তাদের এই সাহচর্য সেই জগতের জন্য নির্দিষ্ট নয়, এ পৃথিবীতেও চলছে। কথার ধারাবাহিকতা বলছে হক ও বাতিলের সংঘাতে বাতিলের অনুসারীদের সাথে যেমন শয়তান ও অপরাধীরা থাকে তেমনি ঈমানদারদের সাথে ফেরেশতারাও

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ
عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৫ রুকূ'

সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান।[৩৬]

হে নবী, সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সেই নেকী দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে।[৩৭] *ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না।*[৩৮] *এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।*[৩৯] *যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্ররোচনা আঁচ করতে পার তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো*[৪০] *তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন।*[৪১]

থাকে। এক দিকে বাতিলপন্থীদের কৃতকর্মসমূহকে তাদের সংগী সাথীরা সুদৃশ্য করে দেখায় এবং তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয় যে, হককে হেয় করার জন্য তোমরা যে জুলুম–অত্যাচার ও বে–ঈমানী করছো সেটিই তোমাদের সফলতার উপায় এবং এভাবে পৃথিবীতে তোমাদের নেতৃত্ব নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে হকপন্থীদের কাছে আল্লাহর ফেরেশতারা এসে সেই সুখবরটি পেশ করে যা পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হচ্ছে।

৩৫. এটা একটা ব্যাপক অর্থবোধক কথা যা দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত ঈমানদারদের জন্য প্রশান্তির একটি নতুন বিষয় বহন করে। পৃথিবীতে ফেরেশতাদের এই উপদেশের অর্থ হচ্ছে, বাতিল শক্তি যতই পরাক্রমশালী ও স্বৈরাচারী হোক না কেন তাদের দেখে কখনো ভীত হয়ো না এবং হকের অনুসারী হওয়ার কারণে যত দুঃখ–কষ্ট ও বঞ্চনাই সইতে হোক সে জন্য দুঃখ করবে না। কেননা, ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য এমন কিছু আছে যার কাছে দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত তুচ্ছ। মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা যখন এই কথাগুলো বলে তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, তুমি সামনে যে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর

হচ্ছো সেখানে তোমার জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই। কারণ, সেখানে জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষমান। আর দুনিয়াতে তুমি যা কিছু ছেড়ে যাচ্ছো সে জন্য তোমার দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা, এখানে আমি তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু। আলমে বরযখ ও হাশরের ময়দানে যখন ফেরেশতারা এ কথাগুলো বলবে তখন তার অর্থ হবে, এখানে তোমাদের জন্য কেবল শান্তি আর শান্তি। পার্থিব জীবনে তোমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছো। সে জন্য দুঃখ করো না এবং আখেরাতে যা কিছু সামনে আসবে সে জন্য ভয় করবে না। কারণ, আমরা তোমাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছি যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হচ্ছে।

৩৬. মু'মিনদের সান্ত্বনা দেয়া এবং মনোবল সৃষ্টির পর এখন তাদেরকে তাদের আসল কাজের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগের আয়াতে তাদের বলা হয়েছিলো, আল্লাহর বন্দেগীর ওপর দৃঢ়পদ হওয়া এবং এই পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তা থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই এমন একটা মৌলিক নেকী যা মানুষকে ফেরেশতার বন্ধু এবং জান্নাতের উপযুক্ত বানায়। এখন তাদের বলা হচ্ছে, এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে, তোমরা নিজে নেক কাজ করো, অন্যদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকো এবং ইসলামের ঘোষণা দেয়াই যেখানে নিজের জন্য বিপদাপদ ও দুঃখ–মুসিবতকে আহবান জানানোর শামিল এমন কঠিন পরিবেশেও দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করো। আমি মুসলমান। মানুষের জন্য এর চেয়ে উচ্চস্তর আর নেই। এ কথার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্য যে পরিস্থিতিতে তা বলা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সে সময় অবস্থা ছিল এই যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করতো সে হঠাৎ করেই অনুভব করতো যেন হিংস্র শ্বাপদ ভরা জংগলে পা দিয়েছে যেখানে সবাই তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য ছুটে আসছে। যে ব্যক্তি আরো একটু অগ্রসর হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য মুখ খুলেছে সে যেন তাকে ছিঁড়ে ফেড়ে খাওয়ার জন্য হিংস্র পশুকুলকে আহবান জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করে সোজা পথ গ্রহণ করা এবং তা থেকে বিচ্যুত না হওয়া নিসন্দেহে বড় ও মৌলিক কাজ।

কিন্তু আমি মুসলমান বলে কোন ব্যক্তির ঘোষণা করা, পরিণামের পরোয়া না করে সৃষ্টিকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান জানানো এবং কেউ যাতে ইসলাম ও তার ঝাণ্ডাবাহীদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করার সুযোগ না পায় এ কাজ করতে গিয়ে নিজের তৎপরতাকে সেভাবে পবিত্র রাখা হচ্ছে পূর্ণ মাত্রার নেকী।

৩৭. এ কথার অর্থও পুরোপুরি বুঝার জন্য যে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা বিবেচনা থাকা দরকার। তখন অবস্থা ছিল এই যে, চরম হঠকারিতার এবং আক্রমণাত্মক বিরোধিতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলা করা হচ্ছিলো যেখানে নৈতিকতা, মানবতা এবং ভদ্রতার সমস্ত সীমা লংঘন করা হয়েছিলো। নবী (সা) ও তাঁর সংগী সাথীদের বিরুদ্ধে সব রকমের মিথ্যা আরোপ করা হচ্ছিলো। তাঁকে বদনাম করা এবং তাঁর সম্পর্কে লোকের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য সব রকমের দুষ্টবুদ্ধি ও কূটকৌশল কাজে লাগানো হচ্ছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিলো এবং শত্রুতামূলক প্রচারনার জন্য পুরো একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে মানুষের মনে

সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো। তাঁকে তাঁর সংগীদেরকে সর্ব প্রকার কষ্ট দেয়া হচ্ছিলো। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর ইসলাম প্রচারের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক হৈ চৈ ও হট্টগোলকারী একদল লোককে সব সময় ওঁত পেতে থাকার জন্য তৈরী করা হয়েছিলো। যখনই তিনি ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্য কথা বলতে শুরু করবেন তখনই তারা শোরগোল করবে এবং কেউ তাঁর কথা শুনতে পাবে না। এটা এমনই একটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক পরিস্থিতি ছিল যে, বাহ্যিকভাবে আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ বলে মনে হচ্ছিলো। বিরোধিতা নস্যাত করার জন্য সেই সময় নবীকে (সা) এসব পন্থা বলে দেয়া হয়েছিল।

প্রথম কথা বলা হয়েছে, সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম সমান নয়। অর্থাৎ তোমাদের বিরোধীরা যত ভয়ানক তুফানই সৃষ্টি করুক না কেন এবং তার মোকাবিলায় নেকীকে যত অক্ষম ও অসহায়ই মনে হোক না কেন দুষ্কর্মের নিজের মধ্যেই এমন দুর্বলতা আছে যা শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থ করে দেয়। কারণ, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বভাব প্রকৃতি দুষ্কর্মকে ঘৃণা না করে পারে না। দুষ্কর্মের সহযোগীই শুধু নয় তার ধ্বজাধারী পর্যন্ত মনে মনে জানে যে, সে মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী এবং সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হঠকারিতা করছে। এ জিনিসটি অন্যদের মনে তার প্রতি সম্মানবোধ সৃষ্টি করা তো দূরের কথা নিজের কাছেই তাকে খাটো করে দেয়। এভাবে তার নিজের মনের মধ্যেই এক চোর জন্ম নেয়। শত্রুতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এই চোর ভেতর থেকেই তার সংকল্প ও মনোবলের ওপর সংগোপনে হানা দিতে থাকে। এই দুষ্কর্মের মোকাবিলায় যে সৎ কর্মকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় বলে মনে হয় তা যদি ক্রমাগত তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সে-ই বিজয়ী হয়। কারণ, প্রথমত সৎ কর্ম নিজেই একটি শক্তি যা হৃদয়-মনকে জয় করে এবং ব্যক্তি যতই শত্রুতাভাবাপন্ন হোক না কেন সে নিজের মনে তার জন্য সম্মানবোধ না করে পারে না। তাছাড়া নেকী ও দুষ্কর্ম যখন সামনা সামনি সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং উভয়ের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট পুরোপুরি উন্মোচিত হয় এমন পরিস্থিতিতে কিছুকাল সংঘাতে লিপ্ত থাকার পর এমন খুব কম লোকই থাকতে পারে যারা দুষ্কর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না এবং সৎ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, দুষ্কর্মের মোকাবিলা শুধুমাত্র সৎ কর্ম দিয়ে নয়, অনেক উচ্চমানের সৎকর্ম দিয়ে করো। অর্থাৎ কেউ যদি তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে আর তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে শুধু সৎকর্ম। উন্নত পর্যায়ের সৎকর্ম হচ্ছে, যে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করবে সুযোগ পেলে তুমি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করো।

এর সুফল বলা হয়েছে এই যে, জঘন্যতম শত্রুও এভাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। কারণ, এটিই মানুষের প্রকৃতি। আপনি যদি গালির জবাব না দিয়ে চুপ থাকেন তাহলে নিসন্দেহে তা হবে একটি নেকী বা সৎকর্ম। অবশ্য তা গালিদাতার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু গালির জবাবে আপনি যদি তার কল্যাণ কামনা করেন তাহলে চরম নির্লজ্জ শত্রুও লজ্জিত হবে এবং আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলার জন্য মুখ খোলা তার জন্য কঠিন হবে। একজন লোক আপনার ক্ষতি করার কোন সুযোগই হাত ছাড়া হতে দেয় না। আপনি যদি তার অত্যাচার বরদাশত করে যেতে থাকেন তাহলে সে

হয়তো তার দুষ্কর্মের ব্যাপারে আরো সাহসী হয়ে উঠবে। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন যদি আপনি তাকে রক্ষা করেন তাহলে আপনার একান্ত অনুগত হয়ে যাবে। কারণ, ঐ সুকৃতির মোকাবিলায় কোন দুষ্কৃতিই টিকে থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও এই সাধারণ নিয়মকে এ অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, উন্নত পর্যায়ের সৎকর্মের মাধ্যমে সব রকমের শত্রুর অনিবার্যরূপে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন জঘন্য মনের মানুষও আছে যে, তার অত্যাচার ক্ষমা করা ও দুষ্কৃতির জবাব অনুকম্পা ও সুকৃতির মাধ্যমে দেয়ার ব্যাপারে আপনি যতই তৎপর হোন না কেন তার বিচ্ছুর ন্যায় বিষাক্ত হুলের দংশনে কখনো ভাটা পড়বে না। তবে এ ধরনের মূর্তিমান খারাপ মানুষ প্রায় ততটাই বিরল যতটা বিরল মূর্তিমান ভাল মানুষ।

৩৮. অর্থাৎ এটা অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা হলেও তা কাজে লাগানো কোন ছেলেখেলা নয়। এ জন্য দরকার সাহসী লোকের। এ জন্য দরকার দৃঢ় সংকল্প, সাহস, অপরিসীম সহনশীলতা এবং চরম আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। সাময়িকভাবে কেউ কোন দুষ্কর্মের মোকাবিলায় সৎকর্ম করতে পারে। এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে এমন সব বাতিলপন্থী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করতে হয় যারা নৈতিকতার যে কোন সীমালংঘন করতে দ্বিধা করে না এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় চূর হয়ে আছে সেখানে দুষ্কর্মের মোকাবিলা সৎকর্ম দিয়ে করে যাওয়া তাও আবার উচ্চ মাত্রার সৎকর্ম দিয়ে এবং একবারও নিয়ন্ত্রণের বাগডোর হাত ছাড়া হতে না দেয়া কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কেবল সেই ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে যে বুঝে শুনে ন্যায় ও সত্যকে সমুন্নত করার জন্য কাজ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে, যে তার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান–বুদ্ধি ও বিচার শক্তির অনুগত করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে নেকী ও সততা এমন গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, বিরোধীদের কোন অপকর্ম ও নোংরামি তাকে তার উচ্চাসন থেকে নীচে নামিয়ে আনতে সফল হতে পারেনা।

৩৯. এটা প্রকৃতির বিধান। অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার মানুষই কেবল এসব গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব গুণাবলীর অধিকারী হয় দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে সাফল্যের মনযিলে মকসুদে পৌছা থেকে বিরত রাখতে পারে না। নীচ প্রকৃতির মানুষ তাদের হীন চক্রান্ত, জঘন্য কৌশল এবং কুৎসিত আচরণ দ্বারা তাকে পরাস্ত করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

৪০. শয়তান যখন দেখে হক ও বাতিলের লড়াইয়ে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দ্বারা হীনতার এবং সুকৃতি দ্বারা দুষ্কৃতির মোকাবিলা করা হচ্ছে তখন সে চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়! সে চায় কোনভাবে একবারের জন্য হলেও হকের জন্য সংগ্রামকারী বিশেষ করে তাদের বিশিষ্ট লোকজন ও নেতৃবৃন্দের দ্বারা এমন কোন ত্রুটি সংঘটিত করিয়ে দেয়া যাতে সাধারণ মানুষকে বলা যায়, দেখুন খারাপ কাজ এক তরফা হচ্ছে না। এক পক্ষ থেকে নীচ ও জঘন্য কাজ করা হচ্ছে বটে, কিন্তু অপর পক্ষের লোকেরাও খুব একটা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ নয়, তারাও তো অমুক হীন আচরণ করেছে। এক পক্ষের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি এবং অপর পক্ষের জবাবী তৎপরতার মধ্যে ইনসাফের সাথে তুলনা মূলক বিচারের যোগ্যতা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে না। যতক্ষণ তারা দেখে বিরোধীরা সব

রকমের জঘন্য আচরণ করছে কিন্তু এই লোকগুলো ভদ্রতা ও শিষ্টাচার এবং মর্যাদা নেকী ও সত্যবাদিতার পথ থেকে বিন্দুমাত্রও দূরে সরে যাচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়তে থাকে। কিন্তু যদি কোথাও তাদের পক্ষ থেকে কোন অযৌক্তিক বা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী আচরণ হয়ে যায়, তা কোন বড় জুলুমের প্রতিবাদে হলেও তাদের দৃষ্টিতে তারা উভয়েই সমান হয়ে যায় এবং বিরোধীরাও একটি শক্ত কথার জবাব হঠকারিতার সাহায্যে দেয়ার অজুহাত পেয়ে যায়। এ কারণে বলা হয়েছে, শয়তানের প্রতারণার ব্যাপারে সাবধান থাকো। সে অত্যন্ত দরদী ও মঙ্গলকামী সেজে এই বলে তোমাদেরকে উত্তেজিত করবে যে, অমুক অত্যাচার কখনো বরদাশত করা উচিত নয়, অমুক কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া উচিত এবং এই আক্রমণের জবাবে লড়াই করা উচিত। তা না হলে তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করা হবে এবং তোমাদের আদৌ কোন প্রভাব থাকবে না। এ ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে কোন অযথা উত্তেজনা অনুভব করবে তখন সাবধান হয়ে যাও। কারণ, তা শয়তানের প্ররোচনা। সে তোমাদের উত্তেজিত করে কোন ভুল সংঘটিত করাতে চায়। সাবধান হয়ে যাওয়ার পর মনে করো না, আমি আমার মেজাজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখছি, শয়তান আমাকে দিয়ে কোন ত্রুটি করাতে পারবে না। নিজের এই ইচ্ছা শক্তির বিভ্রম হবে শয়তানের আরেকটি বেশী ভয়ংকর হাতিয়ার। এর চেয়ে বরং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ তিনি যদি তাওফীক দান করেন ও রক্ষা করেন তবেই মানুষ ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে যে ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন সেটি এ বিষয়ের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে একবার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকলো। হযরত আবু বকর চুপচাপ তার গালি শুনতে থাকলেন আর তাঁর দিকে চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসতে থাকলেন। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন এবং জবাবে তিনিও তাকে একটি কঠোর কথা বলে ফেললেন। তার মুখ থেকে সে কথাটি বের হওয়া মাত্র নবীর (সা) ওপর চরম বিরক্তি ভাব ছেয়ে গেল এবং ক্রমে তা তাঁর পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠতে থাকলো। তিনি তখনই উঠে চলে গেলেন। হযরত আবু বকরও উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন এবং পথিমধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে যখন আমাকে গালি দিচ্ছিলো তখন আপনি চুপচাপ মুচকি হাসছিলেন। কিন্তু যখনই আমি তাকে জবাব দিলাম তখনই আপনি অসন্তুষ্ট হলেন? নবী (সা) বললেন ঃ তুমি যতক্ষণ চুপচাপ ছিলে ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিল এবং তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলো। কিন্তু যখন তুমি নিজেই জবাব দিলে তখন ফেরেশতার স্থানটি শয়তান দখল করে নিল। আমি তো শয়তানের সাথে বসতে পারি না।

৪১. বিরোধিতার তুফানের মুখে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর যে জিনিসটি মু'মিনের হৃদয়ে ধৈর্য, প্রশান্তি ও তৃপ্তির গভীর শীতলতা সৃষ্টি করে তা এই বিশ্বাস যে আল্লাহ বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত নন। আমরা যা করছি তাও তিনি জানেন এবং আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে তাও তিনি জানেন। আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের সব কথাই তিনি শুনছেন এবং উভয়ের কর্মনীতি যা কিছুই হোক না কেন তা তিনি দেখছেন। এই

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ اِنَّ الَّذِيْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

এই[৪২] রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।[৪৩] সূর্য ও চাঁদকে সিজদা করো না, সেই আল্লাহকে সিজদা করো যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি সত্যিই তোমরা তাঁর ইবাদতকারী হও।[৪৪] কিন্তু যদি অহংকার করে এসব লোকেরা নিজেদের কথায় গোঁ ধরে থাকে।[৪৫] তবে পরোয়া নেই। যেসব ফেরেশতা তোমার রবের সান্নিধ্য লাভ করেছে তারা রাত দিন তাঁর তাসবীহ বর্ণনা করছে এবং কখনো ক্লান্ত হয় না।[৪৬]

আর এটিও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি যে তোমরা দেখতে পাও ভূমি শুষ্ক শস্যহীন পড়ে আছে। অতপর আমি যেই মাত্র সেখানে পানি বর্ষণ করি অকস্মাত তা অঙ্কুরোদগমে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। যে আল্লাহ এই মৃত ভূমিকে জীবন্ত করে তোলেন, নিশ্চিতভাবেই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করবেন।[৪৭] নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।

আস্থার কারণেই মু'মিন বান্দা নিজের এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

কুরআন মজীদের এই পঞ্চম বার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও তাঁর মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে দীনে ইসলামের দাওয়াত এবং সমাজ সংস্কারের এ কৌশল শেখানো হয়েছে। এর পূর্বে আরো চারবার চারটি স্থানে এ কৌশল শেখানো হয়েছে। সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ১১০ থেকে ১১৪ আয়াত, টীকাসহ; সূরা আন নাহল, আয়াত ১২৫ থেকে ১২৭ টীকাসহ; সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত ৯৬ টীকাসহ; সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৬ টীকাসহ।

৪২. এখানে জনসাধারণকে উদ্দেশ করে বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করানোর জন্য কয়েকটি কথা বলা হচ্ছে।

৪৩. অর্থাৎ এসব আল্লাহর প্রতিভূ নয় যে, এগুলোর আকৃতিতে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করছেন বলে মনে করে তাদের ইবাদত করতে শুরু করবে। বরং এগুলো আল্লাহর নিদর্শন এসব নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে তোমরা বিশ্ব জাহান ও তার ব্যবস্থাপনার সত্যতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবে এবং এ কথাও জানতে পারবে যে নবী–রাসূল আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ সম্পর্কে যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাই প্রকৃত সত্য। সূর্য ও চাঁদের উল্লেখের পূর্বে দিন ও রাতের উল্লেখ করা হয়েছে এ বিষয়ে সাবধান করে দেয়ার জন্য যে রাতের বেলা সূর্যের অদৃশ্য হওয়া ও চাঁদের আবির্ভূত হওয়া এবং দিনের বেলা চাঁদের অদৃশ্য হওয়া ও সূর্যের আবির্ভূত হওয়া সুস্পষ্ট ভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, এ দু'টির কোনটিই আল্লাহ বা আল্লাহ প্রতিভূ নয়। উভয়েই তাঁর একান্ত দাস। তারা আল্লাহর আইনের নিগড়ে বাঁধা পড়ে আবর্তন করছে।

৪৪. শিরককে যুক্তিসংগত প্রমাণ করার জন্য কিছুটা অধিক মেধাবী শ্রেণীর মুশরিকরা সাধারণত যে দর্শনের বুলি কপচিয়ে থাকে এটা তারই জবাব। তারা বলে, আমরা এসব জিনিসকে সিজদা করি না। বরং এদের মাধ্যমে আল্লাহকেই সিজদা করি। এর জবাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর ইবাদতকারী হয়ে থাকো তাহলে এসব মাধ্যমের প্রয়োজন কি? সরাসরি তাঁকেই সিজদা করো না কেন?

৪৫. "অহংকার করে" অর্থ যে অজ্ঞতার মধ্যে এরা ডুবে আছে যদি তোমাদের কথা মেনে নেয়াকে নিজেদের অপমান মনে করে সেই অজ্ঞতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে।

৪৬. অর্থাৎ এসব ফেরেশতার মাধ্যমে গোটা বিশ্ব জাহানের যে ব্যবস্থাপনা চলছে তা আল্লাহর একত্ব ও দাসত্বের অধীনেই চলছে এবং এই ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক ফেরেশতারা প্রতি মুহূর্তে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের রবের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও দাসত্বে অন্য কারো শরীক হওয়া থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। তবে বুঝানো সত্ত্বেও যদি কতিপয় আহাম্মক না মানে এবং গোটা বিশ্ব জাহান যে পথে চলছে সে পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শিরকের পথে চলতেই গোঁ ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতার পথেই হাবুডুবু খেতে দাও।

এ স্থানটিতে সিজদা করতে হবে এ বিষয়ে সবাই একমত। তবে উপরোক্ত দুটি আয়াতের কোনটিতে সিজদা করতে হবে সে বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ বিনে মাসউদ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করে সিজদা করতেন। ইমাম মালেক এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। এর সমর্থনে ইমাম শাফেয়ীর একটি মতও উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, মাসরূক, কাতাদা, হাসান বাসারী, আবু আবদুর রহমান আস–সুলামী, ইবনে সিরীন, ইবরাহীম নাখায়ী এবং আরো কতিপয় শিক্ষক وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ এর কাছে সিজদা করার পক্ষপাতী। এটি ইমাম আবু হানিফারও মত। তাছাড়া শাফেয়ীদের দৃষ্টিতেও এটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত।

৪৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নাহল, আয়াত ৬৫ টীকাসহ; সূরা হজ্জ, আয়াত ৫ ও ৭ টীকাসহ; সূরা আর রূম, আয়াত ১৯ ও ২০ টীকাসহ; সূরা ফাতের, টীকা ১৯।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ
فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ
لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

যারা[৪৮] আমার আয়াতসমূহের উল্টা অর্থ করে[৪৯] তারা আমার অগোচরে নয়।[৫০] নিজেই চিন্তা করে দেখো যে ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে সেই ব্যক্তিই ভাল না যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নিরাপদ অবস্থায় হাজির হবে সেই ভালো? তোমরা যা চাও করতে থাকো, আল্লাহ তোমাদের সব কাজ দেখছেন। এরা সেই সব লোক যাদের কাছে উপদেশ বাণী আসলে মানতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু বাস্তব এই যে, এটি একটি মহা শক্তিশালী গ্রন্থ।[৫১] বাতিল না পারে সামনে থেকে এর ওপর চড়াও হতে না পারে পেছন থেকে।[৫২] এটা মহাজ্ঞানী ও পরম প্রশংসিত সত্তার নাযিলকৃত জিনিস।

হে নবী, তোমাকে যা বলা হচ্ছে তার মধ্যে কোন জিনিসই এমন নেই যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলদের বলা হয়নি। নিসন্দেহে তোমার রব বড় ক্ষমাশীল[৫৩] এবং অতীব কষ্টদায়ক শাস্তিদাতাও বটে।

৪৮. যে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম আহবান জানাচ্ছেন সেটি যুক্তিসংগত এবং বিশ্ব জাহানের নিদর্শনাবলী তারই সত্যতা প্রতিপাদন করছে, কয়েকটি বাক্যে জনসাধারণকে একথা বুঝানোর পর পুনরায় বক্তব্যের মোড় সেই সব বিরোধীদের দিকে ফিরছে যারা হঠকারিতার মাধ্যমে বিরোধিতা করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়েছিলো।

৪৯. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا (আমার আয়াতসমূহে ইলহাদ করে) 'ইলহাদ' অর্থ ফিরে যাওয়া, সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথের দিকে যাওয়া, বক্রতা অবলম্বন করা। আল্লাহর আয়াত সমূহে ইলহাদের অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সোজা কথার বাঁকা অর্থ করার চেষ্টা করা। আল্লাহর আয়াতসমূহের শুদ্ধ ও সঠিক অর্থ গ্রহণ না করে সব রকম মিথ্যা ও ভুল অর্থ করে নিজেও পথভ্রষ্ট হওয়া এবং অন্যদেরকেও

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۖؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

আমি যদি একে আজমী কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম তাহলে এসব লোক বলতো, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য কথা, আজমী বাণীর শ্রোতা আরবী ভাষাভাষী[৫৪] *এদের বলো, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রোগমুক্তি বটে। কিন্তু যারা ঈমান আনে না এটা তাদের জন্য পর্দা ও চোখের আবরণ। তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন যেন দূর থেকে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।*[৫৫]

পথভ্রষ্ট করতে থাকা। মক্কার কাফেররা কুরআন মজীদের দাওয়াত ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য যে চক্রান্ত করছিলো তার মধ্যে ছিল, তারা কুরআনের আয়াত শুনে তারপর কোন আয়াতকে পূর্বাপর প্রসংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কোন আয়াতের শাব্দিক বিকৃতি ঘটিয়ে কোন বাক্যাংশ বা শব্দের ভুল বা মিথ্যা অর্থ করে নানা রকমের প্রশ্ন উথাপন করতো এবং এই বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতো যে, আজ নবী সাহেব কি বলেছেন তা শোন।

৫০. এ কথাটির মধ্যে একটি হুমকি প্রচ্ছন্ন আছে। ক্ষমতাবান শাসক যদি বলেন, "অমুক ব্যক্তি যে আচরণ করছে তা আমার কাছে গোপন নয়" তাহলে আপনা থেকেই সে কথার অর্থ দাঁড়ায়, তার বাঁচার কোন উপায় নেই।

৫১. অর্থাৎ অনড় ও অবিচল। বাতিলের পূজারীরা এর বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত করছে তার দ্বারা একে পরাভূত করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে আছে সততার শক্তি, সত্য জ্ঞানের শক্তি, যুক্তি–প্রমাণের শক্তি, প্রেরণকারী আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের শক্তি এবং উপস্থাপনকারী রসূলের ব্যক্তিত্বের শক্তি। কেউ যদি মিথ্যা ও অন্তসারশূন্য প্রচারের হাতিয়ার দিয়ে একে ব্যর্থ করে দিতে চায় তাহলে কি তা সম্ভব?

৫২. সামনের দিক থেকে না আসতে পারার অর্থ হচ্ছে কেউ যদি কুরআনের ওপর সরাসরি আক্রমণ করে তার কোন কথা ভুল এবং কোন শিক্ষা বাতিল ও বিকৃত প্রমাণ করতে চায় তাহলে এ ক্ষেত্রে সে সফলকাম হতে পারে না। পেছন দিক থেকে না আসতে পারার অর্থ হচ্ছে কখনো এমন কোন বাস্তব ও সত্য দেখা দিতে পারে না যা কুরআনের পেশকৃত সত্যতা ও বাস্তবতার পরিপন্থী, এমন কোন জ্ঞান–বিজ্ঞান উদ্ভাবিত হতে পারে না যা প্রকৃতই জ্ঞান–বিজ্ঞান এবং কুরআনের বর্ণিত জ্ঞান–বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে।

এমন কোন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে না যা আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন–কানুন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জীবন প্রণালী ও সামাজিকতা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে কুরআন মানুষকে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা ভ্রান্ত প্রমাণ করবে। যে জিনিসকে এ গ্রন্থ ন্যায় ও সত্য বলে ঘোষণা করেছে তা কখনো বাতিল প্রামাণিত হতে পারে না। এর এ অর্থও হতে পারে যে বাতিল সম্মুখ দিক থেকে এসে হামলা করুক বা প্রতারণামূলক পথে এসে অকস্মাত হামলা করুক কুরআন যে দাওয়াত পেশ করছে তাকে সে কোন ভাবেই পরাজিত করতে পারবে না। সমস্ত বিরোধিতা এবং বিরোধীদের সব রকম গোপন ও প্রকাশ্য চক্রান্ত সত্ত্বেও এ আন্দোলন প্রসার লাভ করবে এবং কেউ একে ব্যর্থ করতে পারবে না।

৫৩. অর্থাৎ তাঁর রসূলদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, গালি দেয়া হয়েছে, কষ্ট দেয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি বছরের পর বছর তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। এটা তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫৪. যেসব হঠকারিতার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলা করা হচ্ছিলো এটা তার আরেকটি নমুনা। কাফেররা বলতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব। আরবী তাঁর মাতৃভাষা। তিনি যখন আরবীতে কুরআন পেশ করছেন তখন কি করে বিশ্বাস করা যায়, একথা তিনি নিজে রচনা করেননি, বরং আল্লাহ তাঁর ওপর নাযিল করেছেন। তাঁর একথাকে আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী হিসেবে কেবল তখনই মেনে নেয়া যেতো যদি তিনি এমন কোন ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে শুরু করতেন যা জানেন না। যেমন ফারসী, রোমান বা গ্রীক ভাষা। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ এদের নিজের ভাষায় কুরআন পাঠানো হয়েছে যা এরা বুঝতে সক্ষম। কিন্তু এদের আপত্তি হচ্ছে, একজন আরবের মাধ্যমে আরবদের জন্য আরবী ভাষায় এ বাণী নাযিল করা হলো কেন? কিন্তু অন্য কোন ভাষায় যদি নাযিল করা হতো তাহলে তখনও এই সব লোকই আপত্তি তুলে বলতো— আজব ব্যাপার তো৷ আরব জাতির কাছে একজন আরবকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে এমন এক ভাষায় বাণী নাযিল করা হয়েছে যা রসূল বা গোটা জাতি কেউই বুঝে না।

৫৫. দূর থেকে যখন কাউকে ডাকা হয় তখন তার কানে একটা আওয়াজ প্রবেশ করে ঠিকই তবে আওয়াজ দাতা কি বলছে তা সে বুঝতে পারে না। এটা এমন একটা নজির বিহীন উপমা যার মাধ্যমে হঠকারী বিরোধীদের পুরো মনস্তাত্বিক চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বিদ্বেষ বা পক্ষপাত দোষ মুক্ত লোকের সামনে যদি আপনি কথা বলেন, তাহলে সে তা শোনে, বুঝার চেষ্টা করে এবং যুক্তিসংগত কথা হলে খোলা মনে তা গ্রহণ করে। এটাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে শুধু বিদ্বেষই পোষণ করে না, বরং শত্রুতাও পোষণ করে তাকে আপনি আপনার কথা যতই বুঝাতে চেষ্টা করবেন সে আদৌ সে কথার প্রতি মনোযোগী হবে না। আপনার সব কথা শোনার পরও এত সময় ধরে আপনি তাকে কি বললেন তা সে বুঝবে না। আপনিও মনে করবেন যেন আপনার কথা তার কানের পর্দায় ধাক্কা খেয়ে বাইরে দিয়েই চলে গেছে, মন ও মগজে প্রবেশ করার মত কোন রাস্তাই খুঁজে পায়নি।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

৬ রুকূ'

এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। সে কিতাব নিয়েও এই মতানৈক্য হয়েছিলো[৫৬] তোমার রব যদি পূর্বেই একটি বিষয় ফায়সালা না করে থাকতেন তাহলে এই মতানৈক্যকারীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হতো।[৫৭] প্রকৃত ব্যাপার হলো, এসব লোক সে ব্যাপারে চরম অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত।[৫৮]

যে নেক কাজ করবে সে নিজের জন্যই কল্যাণ করবে। আর যে দুষ্কর্ম করবে তার মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার রব বান্দাদের জন্য জালেম নন।[৫৯]

৫৬. অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক তা মেনেছিলো আর কিছু সংখ্যক লোক তার বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো।

৫৭. একথার দুটি অর্থ একটি অর্থ হচ্ছে, চিন্তা–ভাবনা করা ও বুঝার জন্য মানুষকে যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হবে আল্লাহ যদি পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকতেন তাহলে এ ধরনের বিরোধিতাকারীদের ধ্বংস করে দেয়া হতো। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, সব রকম মতানৈক্যের চূড়ান্ত ফায়সালা আখেরাতে করা হবে আল্লাহ যদি পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতেন তাহলে প্রকৃত সত্যকে এই পৃথিবীতেই উন্মুক্ত করে দেয়া হতো এবং কে ন্যায় ও সত্যের অনুসারী আর কে বাতিলের অনুসারী তাও পরিষ্কার করে দেয়া হতো।

৫৮. এই সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে মক্কার কাফেরদের রোগ পুরাপুরি চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তারা কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত আছে। এই সন্দেহ তাদেরকে চরম অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ বাহ্যত তারা অত্যন্ত তোড়জোড়ের সাথেই কুরআনের আল্লাহর বাণী হওয়া এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রসূল হওয়া অস্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এই অস্বীকৃতি কোন নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, বরং এ ব্যাপারে তাদের মনে রয়েছে চরম দোদুল্যমানতা। এক দিকে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ, প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা এবং অজ্ঞতামূলক বিদ্বেষ কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার এবং পূর্ণ শক্তিতে বিরোধিতা করার দাবী করে। অপরদিকে ভেতর থেকে তাদের মন বলে, এ কুরআন সত্যি সত্যিই এক নজিরবিহীন বাণী। কোন সাহিত্যিক

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي

সেই সময়ের[৬০] জ্ঞান আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়[৬১] এবং সেসব ফল সম্পর্কেও তিনিই অবহিত যা সবে মাত্র তার কুঁড়ি থেকে বের হয়। তিনিই জানেন কোন্ মাদি গর্ভধারণ করেছে এবং কে বাচ্চা প্রসব করেছে।[৬২] যে দিন তিনি এসব লোকদের ডেকে বলবেন, "আমার সেই সব শরীকরা কোথায়?" তারা বলবে ঃ আমরা তো বলেছি, আজ আমাদের কেউ–ই এ সাক্ষ্য দিবে না।[৬৩] তখন সেই সব উপাস্যের সবাই এদের সামনে থেকে উধাও হয়ে যাবে যাদের এরা ইতিপূর্বে ডাকতো।[৬৪] এসব লোক বুঝতে পারবে এখন তাদের জন্য কোন আশ্রয় স্থল নেই।

কল্যাণ চেয়ে দোয়া করতে মানুষ কখনো ক্লান্ত হয় না।[৬৫] আর যখন কোন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ ও মনভাঙা হয়ে যায়। কিন্তু কঠিন সময় কেটে যাওয়ার পর যেই মাত্র আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ চাখাই সে বলতে থাকে, আমি তো এরই উপযুক্ত।[৬৬]

বা কবির নিকট থেকে এ ধরনের বাণী কখনো শোনা যায়নি। না কোন পাগল উম্মাদনার সময় এ ধরনের কথা বলতে পারে। না মানুষকে আল্লাহভীরুতা সৎ কর্ম ও পবিত্রতার শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কখনো শয়তানদের আগমন ঘটতে পারে। একই ভাবে যখন তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলে তখন ভেতর থেকে তাদের মন বলে, আল্লাহর বান্দারা, কিছু লজ্জাও তো তোমাদের থাকা উচিত এ ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? যখন তারা তাঁকে পাগল বলে তখন তাদের বিবেক তাদেরকে ডেকে বলে ওঠে, 'জালেমের দল, তোমরা কি সত্যিই এ ব্যক্তিকে পাগল বলে মনে করো?' যখন তারা তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত সব কিছু ন্যায় ও সত্যের জন্য করছেন না বরং নিজের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

প্রকাশ করার জন্য করছেন তখন তাদের বিবেক ভেতর থেকে তিরস্কার করে বলে, তোমাদের প্রতি লা'নত, যাঁকে তোমরা কখনো ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও খ্যাতির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে দেখনি, যাঁর গোটা জীবন স্বার্থপরতার ক্ষুদ্রতম কালিমা থেকেও মুক্ত, যিনি সর্বদা নেকী ও কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন, কিন্তু কখনো নিজের প্রবৃত্তি ও ব্যক্তি স্বার্থের জন্য কোন অন্যায় কাজ করেননি এমন সৎ ও পবিত্র মানুষকে তোমরা স্বার্থপর বলছো?

৫৯. অর্থাৎ সৎ মানুষের সৎ কর্মকে ধ্বংস করে দিবেন এবং দুষ্কর্মকারীকে তার দুষ্কর্মের শাস্তি দিবেন না, তোমার রব এ ধরনের জুলুম কখনো করতে পারেন না।

৬০. সেই সময় অর্থ কিয়ামত। অর্থাৎ সেই বিশেষ সময় যখন দুষ্কর্মকারীদেরকে তাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে এবং সৎ কর্মশীল সেই সব মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে, যাদের বিরুদ্ধে দুষ্কর্ম করা হয়েছিলো।

৬১. অর্থাৎ সে সময়টি কখন আসবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কাফেররা বলতো, আমাদের ওপর দুষ্কর্মের যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে তা কখন পূরণ হবে? এখানে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদের প্রশ্নের উল্লেখ না করেই তার জবাব দিয়েছেন।

৬২. একথা বলে শ্রোতাদেরকে দুটি বিষয় বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে, শুধু কিয়ামত নয়, বরং সমস্ত গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ নেই অপরটি হচ্ছে, যে আল্লাহ খুঁটিনাটি বিষয় সমূহের এত বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন, কোন ব্যক্তির কাজ কর্ম তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার আওতায় নির্ভয়ে যা ইচ্ছা তাই করা ঠিক নয়। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এই বাক্যাংশের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যাংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একথাটির পরেই যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে বক্তব্যের ধারাক্রম থেকে আপনা আপনি একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের তারিখ জানার ধান্ধায় কোথায় পড়ে আছ? বরং চিন্তা করো কিয়ামত যখন আসবে তখন নিজের এসব গোমরাহীর জন্য কি দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কিয়ামতের তারিখ সম্পর্কে প্রশ্নকারী এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার মাধ্যমেই জবাব দিয়েছিলেন। সহীহ, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি দূর থেকে ডাকলো, হে মুহাম্মাদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, কি বলতে চাও, বলো। সে বললো : কিয়ামত কবে হবে? তিনি জবাবে বললেন : ويحك انها كائنة لا محالة فما اعددت لها "হে আল্লাহর বান্দা, কিয়ামত তো আসবেই। তুমি সে জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো?"

৬৩. অর্থাৎ এখন আমাদের কাছে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়েছে। আমরা যা বুঝেছিলাম তা যে একেবারেই ভ্রান্ত ছিল তা আমরা জানতে পেরেছি। এখন আমাদের মধ্যকার এক জনও একথা বিশ্বাস করে না যে, আপনার খোদায়ীতে আদৌ অন্য কোন অংশীদার আছে। "আমরা আগেই বলেছি" কথা থেকে বুঝা যায়, কিয়ামতের দিন প্রতিটি পর্যায়ে

وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌۢ ﴿٥٤﴾

আমি মনে করি না কিয়ামত কখনো আসবে। তবে সত্যিই যদি আমাকে আমার রবের কাছে নিয়ে হাজির করা হয় তাহলে সেখানেও আমার জন্য থাকবে মজা করার উপকরণসমূহ। অথচ আমি নিশ্চিতরূপেই কাফেরদের জানিয়ে দেব তারা কি কাজ করে এসেছে। আর তাদেরকে আমি অত্যন্ত জঘন্য শাস্তির মজা চাখাবো।

আমি যখন মানুষকে নিয়ামত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্বিত হয়ে ওঠে।[৬৭] কিন্তু যখনই কোন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে।[৬৮]

হে নবী, এদের বলে দাও, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো যে, সত্যিই এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে আর তোমরা তা অস্বীকার করতে থাকো তাহলে সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে যে এর বিরোধিতায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।[৬৯]

অচিরেই আমি এদেরকে সর্বত্র আমার নিদর্শনসমূহ দেখাবো এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও। যাতে এদের কাছে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ কুরআন যথার্থ সত্য[৭০] এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব প্রতিটি জিনিস দেখছেন?[৭১] জেনে রাখো, এসব লোক তাদের রবের সাথে সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।[৭২] শুনে রাখো, তিনি সব জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছেন।[৭৩]

কাফেরদের বার বার জিজ্ঞেস করা হবে, পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর রসূলদের কথা মানতে অস্বীকার করেছিলে। এখন বলো দেখি, তারাই সত্যের অনুসারী ছিলেন না তোমরা? প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাফেররা স্বীকার করতে থাকবে যে রসূলগণ যা বলেছিলেন তাই ছিল সত্য। আর সেই জ্ঞানের বিষয় পরিত্যাগ করে অজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরে থেকে আমরা ভুল করেছিলাম।

৬৪. অর্থাৎ তারা নিরাশ হয়ে এই আশায় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকবে যে, সারা জীবন তারা যাদের সেবা করলো হয়তো তাদের মধ্য থেকে কেউ আসবে এবং আল্লাহর আযাব থেকে তাদের উদ্ধার করবে কিংবা অনন্ত শাস্তির মাত্রা কমিয়ে দেবে। কিন্তু কোথাও তারা কোন সাহায্যকারীকে দেখতে পাবে না।

৬৫. কল্যাণ অর্থ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অঢেল রিযিক, সুস্থতা, সন্তান-সন্ততির কল্যাণ ইত্যাদি। এখানে মানুষ অর্থ প্রতটি মানুষ নয়। কেননা নবী-রসূল ও নেককার মানুষেরাও মানুষের মধ্যে শামিল, কিন্তু তাঁরা এমনটা নন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। এখানে মানুষ বলতে নীচমনা ও অদূরদর্শী মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা কঠিন সময়ে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে কিন্তু পার্থিব আরাম আয়েশ ও ভোগের উপকরণ লাভ করা মাত্র আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই যেহেতু এ দুর্বলতা আছে তাই একে মানব জাতির দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৬৬. অর্থাৎ এসব কিছুই আমি আমার যোগ্যতা বলে লাভ করেছি এবং এসব পাওয়া আমার অধিকার।

৬৭. অর্থাৎ আমার আনুগত্য ও দাসত্ব পরিত্যাগ করে এবং আমার সামনে মাথা নত করাকে নিজের অপমান মনে করতে থাকে।

৬৮. কুরআন মজীদে এ বিষয় সম্পর্কিত আরো কতিপয় আয়াত আমরা পেয়েছি। বিষয়টি পুরোপুরি বুঝার জন্য নিচে বর্ণিত স্থানসমূহ দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ১২; সূরা হুদ, আয়াত ৯ ও ১০ টীকাসহ; বানী ইসরাঈল, আয়াত ৮৩; সূরা-রূম, আয়াত ৩৩ থেকে ৩৬ টীকাসহ; আয যুমার, আয়াত ৮, ৯ ও ৪৯।

৬৯. এর অর্থ এ নয় যে, কুরআন সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়ে থাকলে এর বিরোধিতার ফলে আমাদের ওপর দুর্ভাগ্য নেমে আসতে পারে শুধু এই ভয়ে এর ওপর ঈমান আনো। বরং এর অর্থ হলো, যেভাবে তোমরা না বুঝে শুনে কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা না করে কুরআনকে অস্বীকার করছো, বুঝার চেষ্টা করার পরিবর্তে কানে আঙুল দিচ্ছো এবং অযথা জিদ করে বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়েছো তা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি এবং আল্লাহ তা পাঠাননি বলে জানতে পেরেছো এ দাবীও তোমরা করতে পারো না। একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিতে তোমাদের অস্বীকৃতি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়, ধারণার ভিত্তিতে। বাহ্যত এ ধারণা যেমন অভ্রান্ত হওয়া সম্ভব তেমনি ভ্রান্ত হওয়াও সম্ভব। এই উভয় সম্ভাবনাকে একটু পর্যালোচনা করে দেখো। মনে করো তোমাদের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হলো। এ ক্ষেত্রে তোমাদের ধারণা অনুসারে বড় জোর এতটুকু হবে যে, মান্যকারী ও অমান্যকারী উভয়ের পরিণাম একই হবে। কারণ, মৃত্যুর পর উভয়েই

মাটিতে মিশে যাবে। এর পরে আর কোন জীবন থাকবে না। যেখানে কুফর ও ঈমানের কোন ভাল মন্দ ফলাফল দেখা দিতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং কুরআন যা বলছে তা যদি বাস্তব রূপ নিয়ে সামনে আসে তাহলে বলো তা অস্বীকার করে ও বিরোধিতার ক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হয়ে তোমরা কোন্ পরিণামের মুখোমুখি হবে? কাজেই তোমাদের আপন স্বার্থই দাবী করে, জিদ ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন সম্পর্কে ভেবে দেখো। চিন্তা ভাবনার পরও যদি তোমরা ঈমান না আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাও তবে তাই করো। কিন্তু বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে এ আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করার জন্য এতটা অগ্রসর হয়ো না যে মিথ্যা, চক্রান্ত, প্রতারণা এবং জুলুম-নির্যাতনের অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দেবে এবং শুধু নিজেদের ঈমান আনা থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট মনে না করে অন্যদেরকেও ঈমান আনা থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে।

৭০. এ আয়াতের দু'টি অর্থ। আর দু'টি অর্থই বর্ণনা করেছেন বড় বড় মুফাস্সিরগণ। একটি অর্থ হচ্ছে, অচিরেই এরা নিজ চোখে দেখতে পাবে এ কুরআনের আন্দোলন আশেপাশের সব দেশে বিস্তার লাভ করেছে এবং এরা নিজেরা তার সামনে নতশির। সে সময় তারা জানতে পারবে আজ তাদের যা বলা হচ্ছে তাই ছিল পুরোপুরি ন্যায় ও সত্য। অথচ এখন তারা তা মেনে নিচ্ছে না। কেউ কেউ এ অর্থ সম্পর্কে এই বলে আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, কোন আন্দোলনের শুধু বিজয়ী হওয়া এবং বিরাট বিরাট এলাকা জয় করা তার ন্যায় ও সত্য হওয়ার প্রমাণ নয়। বাতিল আন্দোলনসমূহও বিস্তার লাভ করে এবং তার অনুসারীরাও দেশের পর দেশ জয় করে থাকে। কিন্তু এটা একটা হাল্কা ও গুরুত্বহীন আপত্তি। গোটা বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করেই এ আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলাম যেসব বিস্ময়কর বিজয় লাভ করেছে তা কেবল এ অর্থে আল্লাহর নিদর্শন ছিল না যে, একদল ঈমানদার লোক দেশের পর দেশ জয় করেছে। বরং তা এ অর্থে আল্লাহর নিদর্শন যে তা পৃথিবীর আর দু'দশটি বিজয়ের মত ছিল না। কারণ, ঐ সব পার্থিব বিজয়ে এক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিকে অন্যদের প্রাণ ও সম্পদের মালিক মোখতার বানিয়ে দেয় এবং আল্লাহর পৃথিবী জুলুম নির্যাতনে ভরে ওঠে। অপরদিকে এই বিজয় তার সাথে এক বিরাট ধর্মীয়, নৈতিক, চিন্তাগত ও মানসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব নিয়ে এসেছিলো। যেখানেই এর প্রভাব পড়েছে সেখানেই মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম যোগ্যতা ও গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে এবং কুপ্রবৃত্তি ও অসৎ স্বভাবসমূহ অবদমিত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ কেবল মাত্র দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ এবং নিভৃত বসে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' জপকারীদের মধ্যে যেসব গুণাবলী দেখার আশা করতো এবং দুনিয়ার কায়কারবার পরিচালনাকারীদের মধ্যে যা পাওয়ার চিন্তাও কখনো করতে পারতো না এই বিপ্লব সেই সব গুণাবলী ও নৈতিকতা শাসকদের রাজনীতিতে, ন্যায় বিচারের আসনে সমাসীন বিচারকদের আদালতে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী সেনাধ্যক্ষদের পরিচালিত যুদ্ধে বিজয় অভিযানসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে, রাজস্ব আদায়কারীদের আচরণে এবং বড় বড় কারবার পরিচালনাকারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখিয়েছে। এই বিপ্লব তার সৃষ্ট সমাজে সাধারণ মানুষকে নৈতিক চরিত্র ও আচরণ এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এত উর্ধে তুলে ধরেছে যে, অপরাপর সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তার চেয়ে

অনেক নীচু পর্যায়ের বলে প্রতিভাত হয়েছে। এ বিপ্লব মানুষকে কুসংস্কার ও অমূলক ধ্যান-ধারণার আবর্ত থেকে বের করে জ্ঞান-গবেষণা এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও কর্মনীতির সুস্পষ্ট রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছে। এ বিপ্লব সামাজিক জীবনের সেই সব রোগ ব্যাধির চিকিৎসা করেছে অপরাপর ব্যবস্থায় যার চিকিৎসার ধারণা পর্যন্ত ছিল না। কিংবা থাকলেও সেসব রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সফলকাম হয়নি। যেমন ঃ বর্ণ, গোত্র এবং দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য, একই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ এবং তাদের মধ্যে উচ্চ নীচের বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা, আইনগত অধিকার ও বাস্তব আচরণে সাম্যের অভাব, নারীদের পশ্চাদপদতা ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চনা, অপরাধের আধিক্য, মদ ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন, জবাবদিহি ও সমালোচনার উর্ধে সরকারের অবস্থান, মৌলিক অধিকার থেকেও জনগণের বঞ্চনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চুক্তিসমূহের অমর্যাদা, যুদ্ধের সময় বর্বর ও পশুসুলভ আচরণ এবং এরূপ আরো অনেক ব্যাধি। সবচেয়ে বড় কথা, এ বিপ্লব দেখতে দেখতে আরব ভূমিতে রাজনৈতিক অরাজকতার জায়গায় শৃংখলা, খুন-খারাবি ও নিরাপত্তাহীনতার জায়গায় নিরাপত্তা, পাপাচারের জায়গায় তাকওয়া ও পবিত্রতা, জুলুম ও বে-ইনসাফির জায়গায় ন্যায় বিচার, নোংরামি ও অশিষ্টতার জায়গায় পবিত্রতা ও রুচিশীলতা, অজ্ঞতার জায়গায় জ্ঞান এবং পুরুষাণুক্রমিক শত্রুতার জায়গায় ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে এবং যে জাতির লোকেরা নিজ গোত্রের সরদারী ছাড়া বড় আর কোন স্বপ্নও দেখতে পারতো না তাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর নেতা বানিয়ে দিল। এগুলোই ছিল সেই নিদর্শনাবলী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াত শুনিয়েছিলেন সেই প্রজন্মের লোকেরাই নিজেদের চোখে এসব নিদর্শন দেখেছিলো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে এসব নিদর্শন দেখিয়ে যাচ্ছেন। মুসলমানরা নিজেদের পতন যুগেও নৈতিক চরিত্রের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে যারা সভ্যতা ও শিষ্টাচারের ঝাণ্ডাবাহী সেজে আছে তারা কখনো তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া এবং এমনকি ইউরোপেরও পরাজিত জাতিসমূহের সাথে যে নির্যাতন মূলক আচরণ করেছে মুসলমানদের ইতিহাসের কোন যুগেই তার কোন নজির পেশ করা সম্ভব নয়। কুরআনের কল্যাণকারিতাই মুসলমানদের মধ্যে এতটা মানবিক গুণাবলী সৃষ্টি করেছে যে, বিজয় লাভ করেও তারা কখনো ততটা অত্যাচারী হতে পারেনি ইতিহাসের প্রতিটি যুগে অমুসলিমরা যতটা অত্যাচারী হতে পেরেছে এবং আজও পারছে। চোখ থাকলে যে কেউ নিজেই দেখে নিতে পারে, মুসলমানরা যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্পেনের শাসক ছিল তখন তারা খৃষ্টানদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলো। কিন্তু খৃষ্টানরা সেখানে বিজয়ী হয়ে তাদের সাথে কি আচরণ করেছিলো? হিন্দুস্থানে দীর্ঘ আটশ' বছরের শাসনকালে মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলো। কিন্তু এখন হিন্দুরা বিজয়ী হয়ে তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করছে! বিগত তেরশ' বছর যাবত মুসলমানরা ইহুদীদের সাথে কি আচরণ করেছে আর বর্তমানে ফিলিস্তিনে মুসলমানদের সাথে তাদের আচরণ কেমন!

• এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার মধ্যেও মানুষকে এমন সব নিদর্শন দেখাবেন যা দ্বারা কুরআন যে শিক্ষা দান করছে তা যে সত্য সে কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। কেউ কেউ এ অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে এই

বলে আপত্তি উত্থাপন করেছে যে, আসমান ও যমীনের দিগন্তরাজি এবং নিজের সত্তাকে মানুষ তখনো দেখছিলো। তাই ভবিষ্যতে এসব জিনিসের মধ্যে নিদর্শনাবলী দেখানোর অর্থ কি? কিন্তু ওপরে বর্ণিত অর্থ গ্রহণ সম্পর্কে আপত্তি যেমন হাল্কা ও গুরুত্বহীন এ আপত্তিও তেমনি হাল্কা ও গুরুত্বহীন। আসমান ও যমীনের দিগন্তরাজি নিসন্দেহে ছিল এবং মানুষ তা সব সময় দেখে এসেছে। তাছাড়া সব যুগে মানুষ তার আপন সত্তাকে যেমনটা দেখেছে এখনো ঠিক তেমনটাই দেখছে। কিন্তু এসব জিনিসের মধ্যে আল্লাহর এত অসংখ্য নিদর্শন আছে যে, মানুষ কখনো তা পূর্ণরূপে জ্ঞানের আওতায় আনতে সক্ষম হয়নি এবং হবেও না। প্রত্যেক যুগে মানুষের সামনে নতুন নতুন নিদর্শন এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে।

৭১. অর্থাৎ মানুষকে মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করার জন্য এতটুকু কথা কি যথেষ্ট নয় যে, ন্যায় ও সত্যের এই আন্দোলনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও ব্যর্থ করার জন্য তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তাদের প্রতিটি আচরণ ও তৎপরতা দেখছেন।

৭২. অর্থাৎ তাদের কখনো আপন রবের সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে তারা এ বিশ্বাস পোষণ করে না। তাদের এরূপ আচরণের এটাই মৌলিক কারণ।

৭৩. অর্থাৎ তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করে তারা কোথাও যেতে সক্ষম নয়। তাছাড়া তাঁর রেকর্ড থেকে তাদের কোন আচরণ বাদ পড়াও সম্ভব নয়।